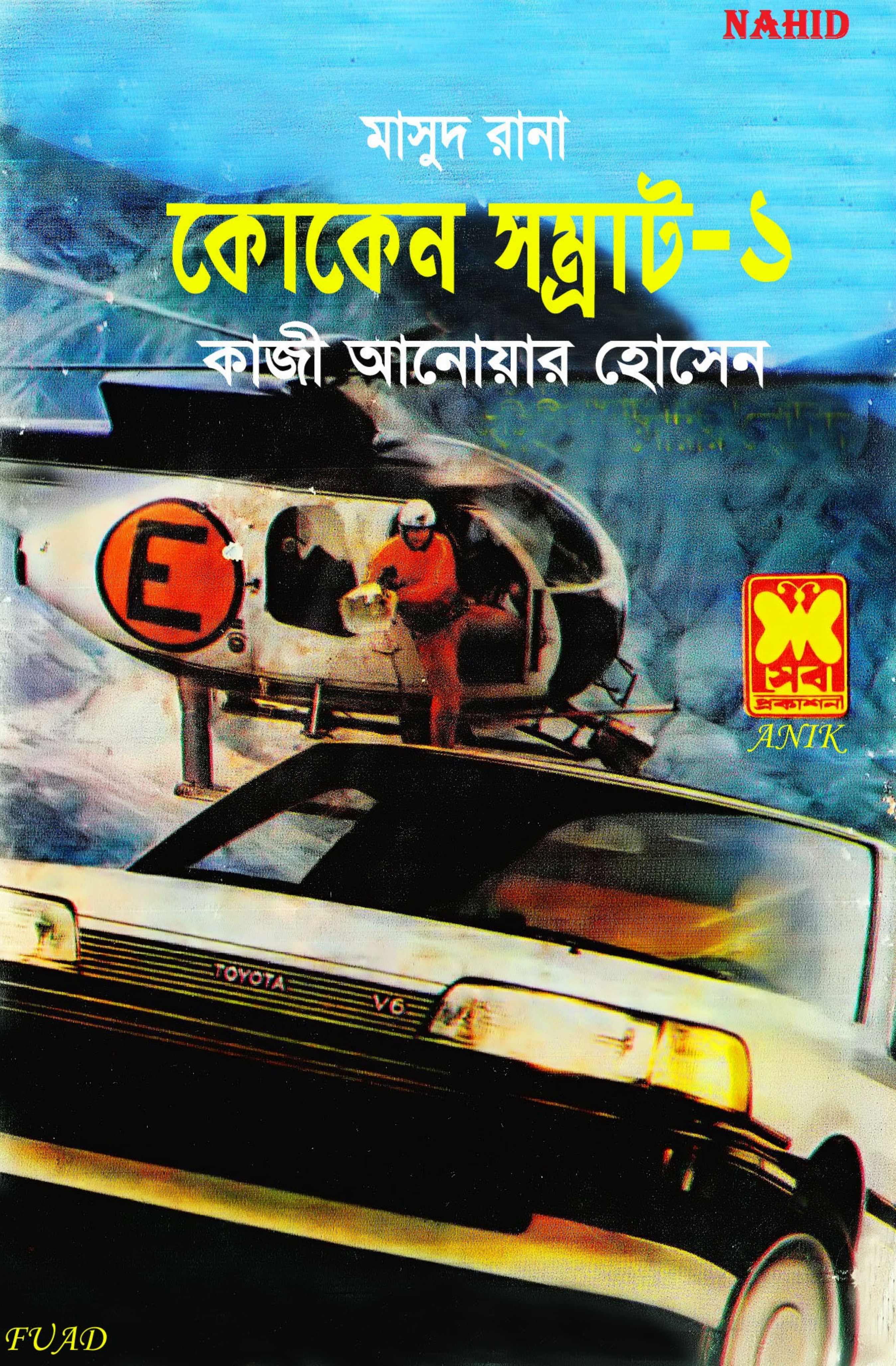
মাসুদ রানা

কোকেন সম্রাট-১

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা-১৭৬

কোকেন সম্রাট-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ব্যাপারটা—

চোরাপথে প্রচুর পরিমাণ কোকেন ঢুকছে বাংলাদেশে।

গোড়াটা কোথায়?

কোত্থেকে আসছে এই কোকেন? কলম্বিয়া?

কলম্বিয়া পৌঁছেই তাজা বোমায় পা দিলো মাসুদ রানা।

ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চাইলো ওকে

লা ব্লাঙ্কা, ওরফে হোয়াইট লেডি।

কোকেন সম্রাটকে একের পর এক খোঁচা মারছে রানা—

ফেলে দিলো মরিসনের স্ট্যাচু,

হানা দিলো ভিক্টর লজেনের হাসিয়েনদায়।

তারপর শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

বাইশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কোকেন সম্রাট ১

মাসুদ রানা ১৭৬

কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যানিং এবং এডিটিং - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

কভার পেজ - সামিউল ইসলাম অনিক

বইটি দেয়ার জন্য নাহিদ ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারতনাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক * মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগরসঙ্গম * রানা ! সাবধান!! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক * কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ? * বিপদজনক * রক্তের রঙ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচদ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর * ব্ল্যাক স্পাইডার * গুপ্তহত্যা * তিন শত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত * সতর্ক শয়তান * নীলছবি * প্রবেশ নিষেধ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ * লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা * হংকং সম্রাট * কুউউ ! * বিদায়, রানা * প্রতিদ্বন্দ্বী * আক্রমণ * গ্রাস * স্বর্ণতরী * পপি * জিপসী * আমিই রানা * সেই উ সেন * হ্যালো, সোহানা * হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা * পালাবে কোথায় * টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস * প্রেতাত্মা * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা * স্বর্ণ সংকট * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা * নিরাপদ কারাগার * স্বর্গরাজ্য * উদ্ধার * হামলা * প্রতিশোধ * মেজর রাহাত * লেনিনগ্রাদ * অ্যামবুশ * আরেক বারমুডা * বেনামী বন্দর * নকল রানা * রিপোর্টার * মরুযাত্রা * বন্ধু * সংকেত * স্পর্ধা * চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু * অগ্নিপুরুষ * অন্ধকারে চিতা * মরণকামড় * মরণখেলা * অপহরণ * আবার সেই দুঃস্বপ্ন * বিপর্যয় * শান্তিদূত * শ্বেত সন্ত্রাস * ছদ্মবেশী * কালপ্রিট * মৃত্যু আলিঙ্গন * সময়সীমা মধ্যরাত * আবার উ সেন * বুমেরাং * কে কেন কিভাবে * মুক্ত বিহঙ্গ * কুচক্র * চাই সাম্রাজ্য * অনুপ্রবেশ * যাত্রা অশুভ * জুয়াড়ী * কালো টাকা

সেবা
প্রকাশনী

কোকেন সম্রাট-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে নেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৭৬

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শরাফত খান

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-176
KOKEN SAMRAT-1
by Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা
প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

এক

২৮ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

'বার্লিন আর আমি একসাথে মরবো,' কথাটা এমন সুরে বলা হলো যেন বার্লিন কোনো শহর নয়, জ্যান্ত কিছু।

হেনেরিক মুলার কোনো জবাব দিলেন না, কারণ এই একই রহস্যময় উক্তি গত এক মিনিটে তিনবার উচ্চারণ করলেন ফুয়েরার। অ্যাডলফ হিটলার নিজের মধ্যে নেই, নাকি অবশেষে নিজেকে তিনি চিনতে পেরেছেন, কোনটা যে ঠিক বুঝতে পারলেন না মুলার। জার্মান জাতির মহাশক্তিধর নেতার মাথার চুল এখন সাদা হয়ে গেছে, একটা হাত অকেজো, আর বাম পা-টা গুলি খাওয়া পশুর মতো তাঁর পিছনে ঝুলে থাকে। তাঁর নীলচে-খয়েরি চোখ দুটো এখন পুরোপুরি একজন বদ্ধ উন্মাদের।

শিরায় টান পড়ায় বা যে-কোনো কারণেই হোক, ভালো হাতটা মৃদু ঝাঁকি খেতে শুরু করলো, তাড়াতাড়ি সেটা মুঠো পাকিয়ে ডেস্কের মাথায় চেপে ধরলেন ফুয়েরার। কয়েকটা ইঞ্জেকশন নেয়ার পর সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য আর মর্যাদা হারিয়ে স্রেফ মাংসের স্তূপে পরিণত হয়ে-

ছেন চীফ। ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তার বিদায় নেয়ার পর দেখা গেল এক-জন মাদকাসক্তকে সরবরাহ বন্ধ করে দিলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাঁরও ঠিক হুবহু সেই অবস্থা হয়েছে। পীড়ন আর শাসন করার উদগ্র কামনা নিস্তেজ হয়ে গেছে, অবশিষ্ট ইচ্ছাশক্তি এখন শুধু মৃত্যুকে ডেকে আনতে চায়। প্রথমে অন্যদের, সবশেষে নিজের। এ-ব্যাপারে ঘড়ির কাঁটা ধরে ভূমিকা পালন করছে রাশিয়ান আর্মি, প্রকৃতির অমোঘ বিধানের মতো পতন ঘটতে যাচ্ছে বার্লিনের।

'তার আগে আমরা বেঈমানদের শায়েস্তা করবো,' বললেন তিনি, ক্ষমা না করার প্রবণতা এখনো তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় সক্রিয়। 'শুরুতে যারা বেঈমানী করেছে, আর এখন শেষ মুহূর্তে যারা করছে, দু'দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

'ইয়েস, চীফ,' বললেন মুলার, বাংকারে তাঁর সব স্টাফই তাঁকে চীফ বলে সম্বোধন করে।

'ফেগেলাইনের মেয়েমানুষটা,' কণ্ঠে অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলেন ফুয়েরার, '···সে কি···সুন্দর?'

'দারুণ।' একেবারে উল্টোকথা বলার আগে এক সেকেণ্ড বিরতি নিলেন মুলার। 'তবে দুশ্চরিত্রা। সন্দেহ নেই, সে-ই ফেগেলাইনকে সর্বনাশা পথে পা বাড়াতে প্ররোচিত করে।'

'তোমার কাছে প্রমাণ আছে, সত্যি সে পালাবার চেষ্টা করেছিল?'

'আছে, চীফ। তার লাগেজ থেকে অনেকগুলো প্রমাণ উদ্ধার করেছে বোরম্যানের লোকজন। সোনা, অলংকার, মোটা অংকের সুইস কারেন্সি। জেরার মুখে সব কথা স্বীকারও করেছে জেনারেল ফেগে-লাইন। তার অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'

ঝুলন্ত পা-টা পিছন দিকে ঠেলে দিলেন হিটলার, যেন রায় ঘোষণার

সময় তাঁর শারীরিক ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হওয়া চলবে না। অবশ্যই তিনি বিবেকের তাড়নায় পীড়িত। ফুয়েরার-বাংকারে এস এস-এর প্রতিনিধিত্ব করছে জেনারেল ফেগেলাইন, তার সৈন্যরা শুধু যে আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বার্লিনের ওপর শত্রুপক্ষের চাপ কমাতেও সফল হয়নি। তবে জেনারেল ফেগেলাইন গ্রেটল-এর স্বামীও বটেন। ইভা ব্রাউন, বহু বছর ধরে হিটলারের রক্ষিতা, তারই ছোটো বোন গ্রেটল। রাজনীতি, না রক্ত? কোন্‌টা বেশি শক্তিশালী?

'ইভা এখন আমার কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়,' বললেন হিটলার। 'কথাটা তুমি বিশ্বাস করো, মুলার?'

'আমি জানি, চীফ।'

পায়ের কাছে বসে থাকা অ্যালসেশিয়ান কুকুরীটার দিকে তাকালেন হিটলার। 'দুনিয়া কোনোদিন জানবে না জার্মান জাতির জন্যে যা অবদান রয়েছে আমাদের, তার কতটুকু সম্ভব হয়েছে শুধু এই মেয়েটির জন্যে।'

তবে মুলার জানেন। তিনিই সম্ভবত ফুয়েরারের যৌন রুচি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। বেশিরভাগ সময় যৌনাবেগের কোনো অস্তিত্বই থাকে না, তারপর হঠাৎ ভয়ংকর রুদ্র মূর্তি নিয়ে মাথাচাড়া দেয়। ফ্রাউলিন ইভা, সাবেক জিমন্যাস্টিক ইনস্ট্রাক্টর; গোটা জার্মানীতে সম্ভবত সে-ই একমাত্র মেয়েমানুষ যার কাছে ফুয়েরারের অনিয়মিত ও চরম যৌন বিকৃতি সামাল দেয়ার মতো শারীরিক উপকরণ আছে।

'আপনার জন্যে ব্যাপারটা বোধহয় কঠিন, স্যার। আপনি যদি বলেন তো আমি ম্যানেজ করতে পারি…।'

'না,' বললেন হিটলার, এক মুহূর্তের জন্যে কর্তৃত্বের সুর ফিরে পেলেন তিনি, যে কর্তৃত্বের সুর গোটা একটা জাতিকে গৌরবের স্বর্ণ-

শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল, তারপর সেখান থেকে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। 'উত্তরটা পরিষ্কার। জেনারেল ফেগেলাইন বার্লিনে মারা যাবে। আমরা সবাই মারা যাবো এখানে।'

খানিক পর হিটলারের সিটিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে স্টাডিরুমে ঢুকলেন মুলার, ফুয়েরারের সেক্রেটারি বোরম্যানের সাথে কথা বলবেন। বিশালদেহী হলেও, বোরম্যানের চেহারায় আভিজাত্য বা কর্তৃত্বের কোনো ভাব নেই, আছে বুনো একটা ভাব, রাইখসলাইটার-এর ইউনিফর্মও সেটা ঢাকতে পারেনি। নির্মম খুনির হাতের মতো শার্টের কলার তাঁর মোটা গলাটা খামচে ধরে আছে, চর্বিবহুল বেঢপ ভুঁড়িটা রীতিমতো কুৎসিত। বেশিরভাগ লোক তাঁকে চাষা বলে ডাকে, যদিও সেটা তাদের উদারতাই বলতে হয়। মার্টিন বোরম্যানকে দেখে মনে হয় আদিম যুগের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি, বাস করেন গুহায়।

তবে বোরম্যানকে ছোটো করে দেখার মতো ভুল মুলারের কখনো হয়নি। রাইখসলাইটার বোরম্যান একটা জিনিস খুব ভালো বোঝেন: কিভাবে তাঁর প্রভুকে খুশি রাখতে হবে। তিনি আরো বোঝেন, বাকি সব তুচ্ছ। বছরের পর বছর ধরে বোরম্যানের প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি চিন্তার বিষয়বস্তু একটাই, কিভাবে ফুয়েরারের চাহিদা পূরণ করা যায়। প্রভুর সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন তিনি, এটা বুঝতে পারার পর থেকে তাঁর চেহারায় নির্ভেজাল উদ্বেগ ফুটে আছে। রাইখসলাইটার বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আজকাল। হিটলার পছন্দ না করলেও, প্রায় সারাক্ষণই তাঁর হাতে জ্বলছে সিগারেট।

পায়ের শব্দ পেলেও, ডেস্কে মেলা ম্যাপটা থেকে দেরি করে মুখ তুললেন বোরম্যান, ভুঁড়ির আড়ালে সেটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে।

'কি ব্যাপার ?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ফুয়েরার নির্দেশ দিয়েছেন বেঈমানদের বিরুদ্ধে এখুনি ব্যবস্থা নিতে হবে, কারো প্রতি দয়া দেখানো চলবে না,' আবেগশূন্য, বেসুরো গলায় বললেন মুলার। 'পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে জেনারেল ফেগেলাইন। এসকর্ট বাহিনী গ্রেফতার করে বাগানে নিয়ে যাবে, ওখানে গুলি করা হবে তাকে।'

'চমৎকার,' বড় বড় দাঁত বের করে হাসলেন বোরম্যান, চওড়া মাড়ির মাথায় এলোমেলোভাবে সাজানো ওগুলো। 'আমার ভয় হচ্ছিলো, স্বজনপ্রীতির কারণে সুবিচার বিঘ্নিত হতে পারে। ভালোই হলো, এখনো যাদের মনে দ্বিধা বা সংশয় আছে তাদের জন্যে কঠিন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ব্যাপারটা।'

মাথা নেড়ে মুলার বোঝাতে চাইলেন বোরম্যানের সাথে তিনি একমত, যদিও ফেগেলাইনের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফিরে গেছে তাঁর মন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বোরম্যানও ছিলেন। মদ্যপ, সুদর্শন, তরুণ এসএস জেনারেলকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে প্রথমবার সম্বোধন করেছিলেন তিনি। পরবর্তী বছরগুলোয় একই বোতল থেকে মদ খেয়েছেন তাঁরা, বিশেষ করে মাটির নিচে আশ্রয় নেয়ার পর থেকে গত কয়েক হপ্তায় তাঁদের ঘনিষ্ঠতা আগের চেয়ে আরো বরং বেড়েছে। একমাত্র বন্ধুর মৃত্যুদণ্ডকে চমৎকার বলে আখ্যায়িত করতে পারেন বোরম্যান, এ থেকেই তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

'ফুয়েরারের নামে আমি একটা নির্দেশ জারি করেছি,' বললেন তিনি। পদমর্যাদার গর্ব তাঁর চেহারা ও সুরে কখনোই অনুপস্থিত থাকে না। 'আর্মির প্রতিটি ইউনিট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবে। কেউ যদি শত্রুর হাতে ধরা দেয়, কোর্ট মার্শাল ছাড়াই তাকে

মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এই আইন-বলে বার্লিনে আমরা মিরাকল ঘটাবো।'

একজন নির্বোধ ফ্যানাটিকের মতো কথা বলছে, তবু তার কথায় সায় দিতেন মুলার, যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে কামানের গোলাটা সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আঘাত করতো। ভোঁতা একটা শব্দ হলো, অনেকটা মট্ করে হাড় ভাঙার মতো। পরবর্তী ধাক্কাটা হলো দীর্ঘস্থায়ী, নাড়া দিয়ে গেল গোটা বার্লিনকে, থরথর করে কেঁপে উঠলো আট ফুট চওড়া কংক্রিটের দেয়ালগুলো, নিস্তেজ হয়ে গেল বাংকারের সবগুলো আলো।

রাশিয়ান আর্মির খোঁচা খেয়ে তাড়াতাড়ি আবার মুখ খুললেন বোরম্যান, এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী তিনি। 'বিষয়টা নিয়ে তাঁর সাথে তুমি কথা বলেছো? তিনি কি যাবেন?'

'শহর ত্যাগ করার কোনো প্রস্তাব শুনতে পর্যন্ত রাজি নন ফুয়েরার,' বললেন মুলার। 'বার্লিনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয়, বলছেন তিনি আত্মহত্যা করবেন।'

চর্বি থলথলে মোটা গলা নিয়ে ষাঁড়ের মতো মাথা ঝাঁকালেন বোরম্যান। 'কাল রাতে ব্যাপারটা নিয়ে ওঁরা আলোচনা করেছেন,' বললেন তিনি। 'টেবিলের চারধারে বসে কে কিভাবে নিজের জীবন দেবেন তারই বর্ণনা শুরু হলো। সবশেষে ফুয়েরার একটা ডকুমেন্ট দিলেন আমাকে—তাঁর টেস্টামেন্ট—উনি মারা যাবার পর দুনিয়ার লোককে জানাতে হবে।'

এর অর্থ দু'জনেরই জানা আছে। উত্তরে রয়েছেন হিমলার, তাঁর কোনো উপায় নেই উত্তরাধিকার দাবি করেন; দক্ষিণে গ্রেফতার হবার পর অপদস্থ হচ্ছেন গোয়েরিং, কাজেই বুদ্ধিহীন বিশিষ্ট ব্যক্তি মার্টিন

বোরম্যান হতে যাচ্ছেন একদিনের বাদশা। কথাটা ভাবতেই আতংক বোধ করলেন মুলার।

তবে, বোরম্যানের বাদশাহী টিকবে না। গত এক দশকে বহুবারই অসম্ভবকে মেনে নিয়েছেন মুলার। এটা ধরে নেয়া যুক্তিসঙ্গত ছিলো না যে মাত্র কয়েক হপ্তায় গোটা ইউরোপ দখল করা সম্ভব, বা জার্মানীর মাটি থেকে সব ক'জন ইহুদিকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে; অথচ কাজগুলো বাস্তবায়িত করা গেছে। 'রাইখসলাইটার, আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের অন্য পরিকল্পনা করা দরকার।'

'বলো,' সাড়া দিলেন ফোরম্যান।

'আমি তোমাকে বলতে চাই, যেমন ফুয়েরারকেও বলেছি, নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে কিছু একটা করার এখনই সময়।'

হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে ভাঁজ করলেন বোরম্যান। 'সম্ভব নয়,' বললেন তিনি। 'দায়িত্ব পালন করতে হলে পালাবার কথা ভুলে থাকতে হবে আমাকে। আমি এখানে, আমার নেতার পাশে থাকবো।'

'অবশ্যই,' অহেতুক জোর দিয়ে বললেন মুলার। 'যতোক্ষণ তোমাকে তাঁর দরকার।'

নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় হলো, দু'জনেই পরস্পরকে পুরোপুরি বুঝতে পারলেন। ডেস্ক থেকে ম্যাপটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করলেন বোরম্যান, মন্ত্রণালয়ের এমন একটা কামরা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ওটা যেখানে খুব কম লোকেরই প্রবেশাধিকার আছে। ম্যাপটা ভাঁজ করার সময় তাঁর চেহারায় চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠলো। 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, হেনেরিক। আমি জানি, তোমার হাতে এই মুহূর্তে অনেক কাজ, কিন্তু সময় খুব কম।'

কনুইয়ের কাছে বোরম্যানকে নিয়ে ছোট্ট কনফারেন্স রুমটা পেরিয়ে

এলেন মুলার, আক্ষরিক অর্থেই বোরম্যান তাঁর কনুইয়ের সাথে সেঁটে থাকলেন। করিডর হয়ে পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে বাংকারের ওপরতলায় উঠে এলেন ওঁরা। করিডরের মাঝখানটায় বোরম্যানের অফিস—বড় দুটো খুপরি, তাঁর আর স্টাফদের জন্যে। বোরম্যানের শক্তি আর স্থূলতা সম্পর্কে জানেন ফুয়েরার, তাঁর নির্দেশ যাতে প্রতিপালিত হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্যে সেক্রেটারির এই গুণ দুটো তিনি ব্যবহার করেন, সেই সাথে তাঁকে গভীর নিভৃত ছায়ায় রাখারও ব্যবস্থা করেছেন।

খুব বেশি কিছু কখনোই চাননি বা আশা করেননি রাইখসলাইটার। যা তিনি পেয়েছেন তাতেই তৃপ্ত বোধ করেছেন—ক্ষমতা। নাৎসী পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বোরম্যান, পৃষ্ঠপোষকদের তালিকা আর তহবিল তাঁর হাতের মুঠোয়, সেই সাথে ফুয়েরারের ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করেন।

অফিসে ঢোকার পর মেয়ে সেক্রেটারিদের অশ্লীল গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দিলেন বোরম্যান। ফ্রাউলিন ক্রুগারের নিতম্বে কষে একটা চাপড় মারলেন, ছুটে পালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো বেচারি। অধস্তনদের সাথে এ-ধরনের অশোভন আচরণ করতে অভ্যস্ত তিনি ; কাল রাতে যদি ওদের কারো সাথে রাতও কাটিয়ে থাকেন বোরম্যান, সে-ও তাঁর এই অশ্লীল অমর্যাদাকর পীড়ন থেকে রেহাই পাবে বলে আশা করতে পারে না। বোরম্যান তাঁর সব ক'জন সেক্রেটারির সাথে রাত কাটান, তারপরও তাঁর শোবার ঘরে ডাক পড়ে অভিনেত্রী আর বেশ্যাদের। বলা হয়, তাঁর রাক্ষুসে যৌনক্ষুধা মিটবার নয়। এ-সবই জানা আছে মুলারের। স্থান-কাল-পাত্রী, সবই তিনি জানেন—জানাটাই তাঁর কাজ।

'বসো, প্লিজ,' বললেন বোরম্যান, দেয়ালের কাছাকাছি একটা চেয়ার ইঙ্গিতে দেখালেন।

বসলেন মুলার। চেয়ারটা এখনো গরম হয়ে রয়েছে, মেয়েলি একটা গন্ধও যেন পেলেন তিনি। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। দরজা বন্ধ করলেন বোরম্যান, ফুয়েরারের গোপন কামরা থেকে সংগ্রহ করা ম্যাপটার ভাঁজ খুললেন। বার্লিন আর চারপাশের এলাকা নিয়ে হাতে আঁকা একটা নক্সা ওটা। লাল কালিতে একটা বৃত্ত এঁকে দেখানো হয়েছে রাশিয়ান সৈন্যদের অগ্রগতি।

থার্ড রাইখ পিছু হটে যেখানে সরে এসেছে, এলাকাটা শুধু মিটার দিয়ে মাপা যায়। বার্লিনের মাঝখানে অবশিষ্ট জায়গাটুকুকে আসলে একটা দ্বীপ বলা চলে, উত্তর দিকে স্প্রি নদী, দক্ষিণে ল্যাণ্ডওয়েহর খাল। দ্বীপের ভেতর রয়েছে টিয়েরগার্টেন-এর কিছু মাঠ আর কংক্রি-টের জঙ্গল—অর্থাৎ দালান-কোঠা ও ভবনাদি। গোটা এলাকাটাকে সিটাডেল বলা হয়। নাৎসী সরকারের অবশিষ্ট ঠাঁই নিয়েছে এখা-নেই।

'দক্ষিণের যুদ্ধক্ষেত্রে শান্ত একটা ভাব দেখা যাচ্ছে,' বোরম্যান বল-লেন, ম্যাপের ওপর হাত রাখলেন তিনি। 'তোমার কি ধারণা?'

'জেনারেল চুইকভ তার সৈন্যদের বিশ্রাম নিতে দিচ্ছে, সেই সাথে নতুন ঢঙে সাজাচ্ছে ব্যাটল লাইন,' বললেন মুলার। 'কাল বারো শো ঘণ্টায় আবার আক্রমণ করবে সে।'

'ঠিক জানো তুমি?'

'নিঃসন্দেহে,' বললেন মুলার। 'মে ডে-তে যে জেনারেল বার্লিনের পতন ঘটাবে, স্ট্যালিন তাকে পুরস্কৃত করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন বীর নায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে তাকে। চুইকভ তা

জানে।'

'তাহলে তো বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার,' বললেন বোরম্যান, সবার জানা পরিষ্কার কথাটাই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। 'গুরুত্বপূর্ণ কোনো অফিসার স্ট্যালিনের হাতে পড়বে, এ ভাবাই যায় না। স্রেফ আত্মহত্যা করা হবে।'

'হ্যাঁ।'

'আর, এমনকি ভাগ্যবান লোকটা যদি রাশিয়ান লাইন ভেদ করে বেরিয়েও যেতে পারে, তারপরও সে শহর ত্যাগ করতে পারবে কিনা সন্দেহ,' কথাটা এমন সুরে শেষ করলেন বোরম্যান, যেন আশা করছেন বাকি অংশটুকু পূরণ করবেন মুলার।

সাথে সাথে নয়, কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুললেন মুলার, 'কাজটা কঠিন। সম্ভবত ভাগ্যের সহায়তা পেতে হবে। আমার কাছে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আছে, রাশিয়ান সৈন্যরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। সাধারণ নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক তারা। অন্তত সিভিলিয়ানদের তারা দেখা মাত্রই গুলি করছে না। ভালো কাগজ-পত্র সাথে থাকলে, আর লোকটা যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়, পার পেয়ে যাবার সম্ভাবনা তার আছে।'

'ভালো কাগজ-পত্র,' বললেন বোরম্যান। 'তারমানে তুমি বলতে চাইছো জাল পরিচয়-পত্র। ওগুলো সাথে পাওয়া গেলে তোমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হবে, হেনেরিক।'

কিছু বললেন না মুলার, কারণ দু'জনেই তাঁরা জানেন যে সরকারের প্রতিটি অফিসার এক বা একাধিক অতিরিক্ত পরিচয়-পত্র সাথে রাখছেন। রাইথ সিকিউরিটির ডকুমেণ্ট সেকশন আর সব কাজ বাদ দিয়ে গত তিন মাস ধরে শুধু জাল কাগজ তৈরি করছে। নিজের জন্যে বোরম্যানও কয়েকটা পরিচয়-পত্র তৈরি করিয়েছেন, তাঁর স্টাফরাও

বাদ যায়নি। প্রায় প্রত্যেকেই ইহুদিদের নামের সাথে মিল রেখে নতুন নাম গ্রহণ করেছে।

‘ঠিক আছে, ধরা যাক, লোকটার কাছে ভালো কাগজ আছে,’ ঠোঁটে শান্ত, ক্ষীণ হাসি নিয়ে বললেন বোরম্যান। ‘মুক্ত হওয়ার আগে তারপরও তো তাকে আরো অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, তাই না ? প্রথম কাজ বেঁচে থাকা।’

‘নিরাপদ একটা লুকানোর জায়গা পেতে হবে তাকে,’ বললেন মুলার, তাঁর মুখভাব দেখে মনে হলো কঠিন শর্ত আরোপ করছেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলেন বোরম্যান, তাঁর গোটা শরীর দুলে উঠলো। তারপর শরীরটা আড়ষ্ট হলো, কোমর ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকলেন, উরু দুটোর ওপর হাত রেখে কাছ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মুলারের দিকে। ‘সে-ধরনের একটা জায়গার কথা শুনেছি আমি,’ তাঁর চাপা গলা খসখসে শোনালো। ‘বলা হয় সেটা নাকি আরেকটা বাংকার···একটা গোপন বাংকার···আরেকটা সিটাডেল—তবে আরো ছোটো, আরো নির্জন। এমনভাবেই লুকানো আছে যে আমার একজন এজেন্ট অনেক চেষ্টা করেও ওটার কোনো হদিশ বের করতে পারেনি। বলা হয়, মাত্র একজনই নাকি ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে।’

‘রাইখসলাইটার, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করছি, যে-লোকটার কথা তুমি বলছো সে আসলে একজন বেঈমান।’

‘আজ—হ্যাঁ। কাল—কে বলতে পারে!’ অর্থটা পরিষ্কার করার জন্যে কাঁধ ঝাঁকালেন বোরম্যান, শূকরসদৃশ তাঁর মুখটাও যেন ঝাঁকি খেলো। ‘তবে একটা কথা ঠিক, অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতর বিরাট

এক ধনী লোক হওয়ার সুযোগ আছে তার।'

'কোন্ কারেন্সিতে?' জিজ্ঞেস করলেন মুলার, তাঁর চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি।

'সুইস ফ্র্যাঙ্ক।'

'কোথায় জমা আছে?'

'জুরিখে।'

'নম্বর?'

'সেটা জানতে পারবে মাত্র কয়েকজন, শুধু তারাই টাকাগুলোর ভাগ পাবে,' বললেন বোরম্যান। 'সংক্ষেপে, যারা বেঁচে যাবে।'

'এই কয়েকজনের পরিচয়?'

চেহারা দেখে মনে হলো প্রশ্নটা সরাসরি করায় আহত হয়েছেন রাইখসলাইটার। তবে মুলার তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন মানুষ নামক পশু নির্যাতন ভোগের সময়, বড় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবার পরও, তুচ্ছ অপরাধের অভিযোগ প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার করে। একজন খুনি ব্যভিচারের অভিযোগ অস্বীকার করবে, একজন ধর্ষকামী অস্বীকার করবে সিঁদ কাটার অভিযোগ। রাইখসলাইটার বোরম্যান, যিনি এ-ধরনের সব অপরাধেই হাত পাকিয়েছেন, সঙ্গী বেঈমানদের নাম উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করবেন তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। আলোচনাটা থেমে থাকলেও, সময়টুকু অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো না পর পর তিনটে কামানের গোলা বিস্ফোরিত হওয়ায়। কাছাকাছিই পড়লো কোথাও, সম্ভবত মন্ত্রণালয়ের বাগানে, যেখানে জেনারেল ফেগেলাইন তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তিনটে বিস্ফোরণের সাথে তিনবার নিভু নিভু হলো আলো। তারপর আবার নিস্তব্ধতা নামলো কামরার ভেতর।

'কালটিনব্রুনার আর তার মিসট্রেস,' গম্ভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন বোরম্যান। 'আর আমি।'

আচ্ছা। আর্নেস্ট কালটিনব্রুনার হলেন রাইখ সিকিউরিটির চীফ, বুদ্ধি করে কয়েকদিন আগেই বার্লিন ছেড়ে বাভারিয়ায় চলে গেছেন তিনি। তাঁর রক্ষিতা কাউন্টেস ফন ওয়েসট্রপ, গত কয়েক মাসে অন্তত দু'বার সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এসেছে। 'কোত্থেকে যোগাড় হলো টাকাগুলো?' জানতে চাইলেন মুলার।

'বেশিরভাগই ইহুদিদের কাছ থেকে এসেছে,' বোরম্যান জানালেন। 'সৎ কোনো পার্টি মেম্বারের কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয়া হয়নি, বিশ্বাস করো।'

'ফেরত পাবার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

কোটের পকেটে হাত ভরে সাদামাঠা একটা এনভেলাপ বের করলেন বোরম্যান, এনভেলাপের ওপর তাঁর নিজের হাতে লেখা দুটো শব্দ—অপারেশন ওভারসীজ। 'টাকাগুলো আছে একটা ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে, চারভাগে,' গোপন লেনদেনে অভ্যস্ত একজন মানুষ, তাঁর বলার ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব আর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠলো। 'তিন ভাগ টাকা জমা আছে আগে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের সাংকেতিক নামে। শেষ ভাগের টাকাটা পাবে এই চিঠির বাহক।'

'কতো টাকার অ্যাকাউন্ট, রাইখসলাইটার?' জিজ্ঞেস করলেন মুলার, তাঁর হাবভাব দেখে বোঝার উপায় নেই যে জানা কথাই নতুন করে জেনে নিচ্ছেন তিনি।

'প্রায় পঞ্চান্ন মিলিয়ন মার্কিন ডলার,' হিসেব করার জন্যে বিরতি না নিয়েই অঙ্কটা উচ্চারণ করলেন বোরম্যান। 'বিনিময় হার, সুদ ইত্যাদি কারণে অঙ্কটা সামান্য কমবেশি হতে পারে। ট্রাস্টিদের

কাউকে মৃত বলে ঘোষণা করা হলে, তার ভাগের টাকা চলে যাবে আলাদা একটা ফাণ্ডে, ওই ফাণ্ড থেকে সংকটে পড়া বন্ধুদের সাহায্য করা হবে।'

'গুড,' শান্ত সুরে বললেন মুলার। 'চিঠিটা নেবো আমি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন বোরম্যান, সম্ভবত ভাবছেন, গোটা আয়োজনটা মুলারের নির্দেশে করা হলেও, চিঠিটা তার বিরুদ্ধে বেঈমানীর প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তবে উদ্বিগ্ন হবার তেমন কোনো কারণ নেই, একাধিক পরিচয়-পত্র তৈরি করে রেখেছেন তিনি, পালাবার সময় কোন্‌টা ব্যবহার করবেন কেউ তা জানে না। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে চিঠিটা মুলারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'বেশ,' বললেন। 'পরস্পরকে আমরা বিশ্বাস করলাম।'

বোরম্যানের শব্দচয়ন লক্ষ্য করে হাসি পেলেও হাসলেন না মুলার। চিঠিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি, সন্তুষ্ট হয়ে চেয়ার ছাড়লেন, তারপর দেয়ালে সাঁটা বড় ম্যাপটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ম্যাপে ৮নং প্রিঞ্জ-আলব্রেখট-স্ট্রাসে রয়েছে, ওটাই তার হেডকোয়ার্টার ছিলো, কামানের গোলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হেডকোয়ার্টার ছেড়ে আইখম্যানের হেডকোয়ার্টার কারফরস্‌টেনস্ট্রাসেতে আশ্রয় নেন তিনি, জেনারেল চুইকভের সৈন্যরা ওটার ওপর হামলা চালায় ছাব্বিশ তারিখে।

মুলারের দৃষ্টি ম্যাপটার উত্তর আর পশ্চিম দিকে সরে এলো, একটা আঙুল তাক করে তিনি বললেন, 'দু'মাস আগে, রাইখসলাইটার, বিমান হামলা চলার সময়, এই মোয়াবিট এলাকার কাছাকাছি কিছু বিল্ডিঙের ওপর একগাদা বোমা পড়ে। রাস্তার খানিক সামনে একটা

ছোটো ভাঁটিখানা ছিলো, বোমার আঘাতে গুরুতর ক্ষতি হয় সেটার। আর্থিক বিবেচনায় মেরামত করার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে সেলার-গুলো অক্ষতই ছিলো। ওগুলোকে আরো মজবুত ও প্রয়োজনীয় উপ-করণে সাজাবার জন্যে ছোটো একটা বিদেশী শ্রমিক দলের শ্রম আর প্রাণ ব্যয় করা হয়। ডিফেন্সিভ পজিশন হিসেবে আমাদের সৈন্যরা বিল্ডিংটাকে ব্যবহার করেনি, ব্যবহার না করার নির্দেশ থাকায়। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, এই বাংকারটা ছোঁয়নি কেউ।'

'চতুর!' ব্যঙ্গ নয়, বোরম্যানের কণ্ঠে ঈর্ষা। 'আমি তোমার প্রশংসা করি, মুলার।'

'এটা পিঠ চুলকানোর সময় নয়, রাইখসলাইটার। আজ পথটা আমাদের দখলে আছে, কিন্তু কাল···।'

'আমি বুঝতে পারছি।'

'আমার পরামর্শ হলো, বেরোবার পথ হিসেবে আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজগুলোই ভালো। গোয়েরিং স্ট্রাসে আর টিয়েরগার্টেন হয়ে। ওদিকের এভিনিউটা যদি বন্ধ দেখো, তাহলে তুমি সাবওয়ে প্যাসেজ ধরে উত্তর দিকে যেতে পারো, ফেডরিখস্ট্রাসে ধরে খানিকদূর গেলেই তো নদী।'

'শুনেছি এরইমধ্যে নাকি রেড আর্মি সাবওয়েতে ঢুকতে শুরু করেছে,' গম্ভীর মুখে বললেন বোরম্যান। 'অ্যানহল্টার স্টেশন দখল করে নিয়েছে ওরা।'

'মাঝে মধ্যে এমনকি মানবেতর প্রাণীরাও সামনে থেকে বা সরা-সরি হামলা চালাতে উৎসাহ বোধ করে না।' মুলারের চেহারা নির্লিপ্ত। 'পালাবার যে-কোনো সুযোগ দেখামাত্র তাড়াতাড়ি কাজে লাগাতে হবে তোমার।'

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন বোরম্যান। খানিকটা অন্যমনস্ক দেখালো তাঁকে। আগেভাগে রওনা হতে না পারলে পালাবার পথগুলো নিষ্কণ্টক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, আবার নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা না ঘটলে তাঁর রওনা হবারও উপায় নেই। 'আমি বুঝতে পারছি, এটাই আমাদের শেষ দেখা, মুলার।'

'এখানে, হ্যাঁ।'

বুকশেলফের দিকে হাত বাড়ালেন রাইখসলাইটার, তাঁর কোড বুকগুলো এখানেই থাকে। কয়েকটা বই মেঝেতে ফেলে দিলেন তিনি, শেলফের পিছন থেকে বের করে আনলেন ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল। আরেক শেলফ থেকে ছুটো অপরিষ্কার গ্লাস নিলেন তিনি। সেক্রেটারির টেবিলে গ্লাস ছুটো রাখলেন, বোতল থেকে ব্র্যাণ্ডি ঢাললেন। মুলারকে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'নরক কিংবা সুইটজারল্যাণ্ড, যেটা আগে আসে।'

'আমাকেও কিছু যোগ করতে দাও,' বললেন মুলার, গ্লাস ছুটো মৃছু ধাক্কা খেলো। 'টু দ্য ফোর্থ রাইখ।'

দুই

৬ই অক্টোবর, ১৯৮৬। মেডিলিন, কলম্বিয়া।

প্রাণটা অ্যাভিয়ানকা পাইলটদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলো মাসুদ রানা, পশ্চিম গোলার্ধে এটাই সবচেয়ে পুরনো এয়ারলাইন। ঝুঁকিবহুল বিমানপথে দক্ষ পাইলটদের অভিজ্ঞতাই এক-মাত্র ভরসা। আন্দেজের বিশাল তিনটে শৈলশির পঁচিশ হাজার ফুট ওপর থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ ওগুলোর একটাকে লক্ষ্য করে ঘুড়ির মতো খাড়া গোঁত্তা দিয়ে নামতে শুরু করলো প্লেন। মাঝখানের ওই পাথুরে মেরুদণ্ডটাকে সেন্ট্রাল কর্ডেলেরা বলা হয়, দেখে মনে হবে অকস্মাৎ পাক খেয়ে নামতে শুরু করেছে পাহাড়ী উপত্যকার ওপর সাজানো একটা শহরের দিকে। বোগোটাতেও এই একই দৃশ্য দেখেছে রানা। গোটা দেশটাই খাড়া পাহাড়ের সমষ্টি, কলম্বিয়াকে সম্ভবত বিমান পথই এক করে রেখেছে।

এয়ারলাইন টার্মিন্যালের সামনে একটা ট্যাক্সি দেখলো রানা, আরোহীরা নামছে, সেটাও মান্ধাতা আমলের বলে মনে হলো। উনিশশো চৌষট্টি সালের শেভ্রোলে বেল এয়ার, ভেতরে একটা ক্যাডি-

লাকের চেয়ে বেশি জায়গা। যদিও রানা নিশ্চিত যে এখানে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে প্রায় কেউই কিছু জানে না, তবু অপেক্ষারত কোনো ট্যাক্সিতে চড়ে সতর্কতা অবলম্বনের নিয়ম ভাঙতে রাজি নয় ও। তাছাড়া, পুরনো হলেও শেভ্রোলেটা ওর মনে ধরেছে, অনেকদিন পর এ-ধরনের একটা গাড়িতে চড়ার সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

ড্রাইভারকেও পছন্দ হলো ওর। গায়ের টি-শার্টে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, 'পে অর ডাই'। পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়স হবে, নাকের নিচে ওটা গোঁফ নয়, যেন জ্যান্ত একটা প্রজাপতি, হাত বাড়ালেই উড়ে যাবে। পেশীবহুল হাত দুটো হুইল নয়, যেন জাহাজের হেল্‌ম্ ঘোরাচ্ছে। ধাতব ড্যাশবোর্ডের একদিকে যিশুর একটা মূর্তি, অপর দিকে দাঁড়িয়ে আছে চে গুয়েভারা। দুটো মূর্তি একই আকারের, দেখতেও প্রায় একইরকম, তবে যিশুর মাথায় একটা মুকুট পরানো হয়েছে। এ এমন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, গোটা টেবিলের সমস্ত টাকা পাবার জন্যে বাজি ধরে।

'আপনি কি আরবের একজন শেখ, সিনর?'

'ক্যানাডিয়ান,' বললো রানা, মিথ্যেটা সত্যি বলে চালাবার জন্যে সাথে একটা পাসপোর্ট ওর আছে।

রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে আগ্রহী হবার ভান করলো ড্রাইভার। 'আমার এক মামাতো ভাই আছে, মন্ট্রিলে থাকে।'

'দুঃখিত, আমার কোনো ভাই-বেরাদার কোথাও নেই। আমি একা।'

লোকটা বুঝতে পারলো তাকে বলা হচ্ছে নিজের চরকায় তেল দাও, তবে গ্রাহ্য না করার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় সে। 'আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও, বন্ধু-বান্ধব তো থাকতেই পারে,' বললো ড্রাইভার।

'মেডিলিনে তেমন কেউ আছে আপনার?'

'শহরের কাউকে আমি চিনি না।'

'তাহলে বলতে হয়, ব্যাপারটা অদ্ভুত, সিনর। ভারি অদ্ভুত।'

রানা জানে এরপর লোকটা কি প্রশ্ন আশা করছে। 'কেন?'

'কারণ, আমি ভয় করছি, কেউ আপনাকে চেনে।'

ভাবতে পছন্দ করে রানা, ও কখনো বিস্মিত হয় না। মাঝে মধ্যে বিভ্রান্ত হয় বটে, যতোক্ষণ না প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়। বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টে ওকে কেউ সাহায্য করছে না, এমন কোনো সূত্র নেই যা অনুসরণ করা যেতে পারে, আর দুনিয়ার মাত্র তিনজন মানুষ জানে কোথায় যাচ্ছে ও। বিস্তারিত জানে মাত্র একজন। 'কি ধরনের গাড়ি?' জানতে চাইলো ও।

'জাপানী,' জবাব দিলো ড্রাইভার।

'ক'টা মাথা?'

'দুটো দেখতে পাচ্ছি,' বললো সে, একটা আঙুলের পুরোটা খাড়া করলো, ভাঁজ করা অর্ধেক দ্বিতীয়টার।

শিকারী শিকারে পরিণত হলে উত্তেজনা বাড়েই। যে শিকারকে খুঁজে বের করার নির্দেশ ও অনুরোধ পেয়েছে রানা, তাঁর দ্বারা ক্ষতি-গ্রস্ত দু'একজনের স্মৃতি বাদে, গত চল্লিশ বছরে তাঁকে কোথাও দেখা যায়নি। সম্ভব হলে জীবিত আটক করতে হবে তাঁকে। এক সময় তিনি ইন্টেলিজেন্স অফিসার ছিলেন, তাঁর যুগের সেরা প্রতিভাদের একজন, অর্থাৎ যেমন নিষ্ঠুর তেমনি দক্ষ। তাঁর সন্ধান পাওয়া খুব সহজ হবে বলে আশা করে না রানা।

চওড়া অটোপিসটা-য় ষাট ডিগ্রী বাঁক ঘুরছে ট্যাক্সি, পিছনের গাড়ি-টার দিকে তাকাবার জন্যে এই মুহূর্তটাই বেছে নিলো রানা। একটা

হোণ্ডা প্রিলিউড। দক্ষ হাতে পড়েছে গাড়িটা, রাস্তার এক পাশ ঘেঁষে সাবলীল গতিতে আসছে। দুটোই মাথা, তবে সহজে চোখে পড়ে না। দুটোর কোনোটাই গাড়ির হেডরেস্টের চূড়ো ছুঁতে পারেনি। ব্যাপারটা মোটেও স্বস্তিকর নয়। শরীর-স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির অভাব সাধারণত স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পূরণ করা হয়। রানা যাঁর খোঁজে এসেছে, আজকাল তিনি নিজের পরিচয় দেন রলফ মুয়েলার বলে। নিজেকে ডাচ বলে দাবি করেন, কলম্বিয়ায় স্থায়ী আসন গেড়েছেন, সফল একজন ব্যবসায়ী। হোণ্ডার আরোহীরা যদি তাঁর লোক হয়, অবশ্যই পেশাদার হবে ওরা, মোটা টাকার বিনিময়ে কাজ করছে।

'আমরা কি করবো, সিনর?' জানতে চাইলো ড্রাইভার। 'আপনি আমাকে নির্দেশ দেবেন না?'

'কিছুই করো না,' বললো রানা। 'হোটেল শেরাটনের দিকে যেতে থাকো।'

আবার রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখলো ড্রাইভার। নতুন করে আরোহীর মাপজোক নিলো সে। প্রথমবারও সে তার আরোহীকে ট্যুরিস্ট বা হাবাগোবা বলে ধরে নেয়নি, তবে এবার তার শান্ত নির্লিপ্ত চেহারা দেখে আন্দাজ করলো, মাছটা গভীর জলেরই হবে। চরিত্র ও প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা বাদ দিয়ে দু'বার চোখ মিটমিট করলো সে। তারপর মুখ খুললো, 'সিনর, আপনার মতো ঠাণ্ডা মানুষকে অপমান করার স্পর্ধা আমার নেই। তবে, আপনাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করছি যে চলতি বছর আমাদের মেডিলিন শহরে পনেরো শোর বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এই তথ্য আমি আমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি, পুলিশ বিভাগে আছেন তিনি। জোর দিয়ে বলতে পারি, হিসেবটায় কোনো ভুল নেই।'

'পারিবারিক অঘটনের কথা বলছো তুমি ?'

'দু'একটা, সিনর। বাকি সব ককেরসদের কাজ।'

'ককেরস ?'

'আপনার ডিকশনারিয়োতে শব্দটা পাবেন না, সিনর। শব্দটার একাধিক অর্থের একটা হলো, যারা কোকেন ব্যবহার করে। তবে আজকাল সবকিছুর মতো শব্দটার মানেও বদলে গেছে। ককেরস বলতে মানুষ এখন বোঝায়, সম্ভবত, একজন কাউবয়। কোকেন কাউ-বয়।'

'তুমি কি বলতে চাইছো যে বন্দুকে এঁরা খুব ওস্তাদ ?'

'সিনর, আমি আপনাকে বলছি, ককেরসরা খুন করার ব্যাপারে বাছবিচার করে না। আমাদের দেশে আপনি একজন মেহমান, অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ওরা বিচারকদেরও খুন করেছে, এমন কি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বা সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারকেও বাদ দেয়নি। চলতি বছর শুধু পুলিশই খুন হয়েছে কয়েক শো। এ-সব তথ্যও আমি আমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি।'

লোকটার দেয়া পরিসংখ্যান অবিশ্বাস করলো না রানা। দুনিয়া-দারির খবর রাখা যাদের অভ্যেস, কলম্বিয়ার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই। দেশটার পরিস্থিতি সম্পর্কে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর তথ্য ভাণ্ডারও পরিষ্কার একটা ছবি পেতে সাহায্য করেছে ওকে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির বিশে-ষজ্ঞরাও ওকে ব্রিফিং করেছে। দুটোই মার্কিন সংগঠন। মেডিলিন হলো কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেল-এর হেডকোয়ার্টার, কোকেন সম্রাটদের স্বর্গরাজ্য। বিশের দশকে শিকাগোয় যে ভয়ংকর পরিস্থিতি ছিলো, আজকের কলম্বিয়ার অবস্থা ঠিক সেরকম, পার্থক্য এইটুকু যে ধরার

জন্যে আরো কয়েক লক্ষ গুণ বেশি টাকা উড়ছে এখানে, অস্ত্রগুলোও সেই হারে মারাত্মক।

'তোমার নাম কি বললে না যে?'

'পিটার পিনেল, সিনর।'

ড্যাশবোর্ডের একটা মূর্তির ব্যাখ্যা পাওয়া গেল—নামের খাতিরে যিশুর উপস্থিতি। রানা অনুভব করলো, চে-র উপস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়ার কোনো ইচ্ছে ওর মনে জাগছে না। 'পিনেল, আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ড্রাগ ব্যবসার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'এভাবে যখন বলছেন, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো।'

'তবে জাপানী গাড়িটা যদি সরাসরি পাশে চলে আসার চেষ্টা করে, নিরাপত্তার খাতিরে যে-কোনো কৌশল খাটাবার অধিকার তোমার আছে।'

আয়নায় এক মুহূর্ত চোখ রেখে কৃতজ্ঞতার সাথে হাসলো পিনেল। নির্দেশ, নির্দেশের ভাষা, দুটোই তার ভারি পছন্দ হলো। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে তার দুলাভাই ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করতো। রানার বিশ্বাস, গাড়ি দুটোর মাঝখানের ব্যবধান অবশ্যই বাড়াতে পারবে পিনেল, হোণ্ডাকে যদি খসাতে না-ও পারে। চেহারা দেখে ওর মনে হয়েছে, নিজের পেশায় লোকটা দক্ষ।

কিন্তু নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পিনেলকে দেয়া হলো না। ওদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নিলো না হোণ্ডা, আগের মতোই বরাবর দুশো গজ পিছনে থাকলো। অটোপিসটা ছেড়ে মেডিলিন শহরের মাঝখানে ঢোকার খানিক আগে থেকেই ট্রাফিকের সংখ্যা বেড়ে গেল, সেই সাথে সতর্ক হয়ে উঠলো পিনেল। এই প্রথম দূরত্ব কমিয়ে আনার

চেষ্টা করলো হোণ্ডার ড্রাইভার। খানিকটা কাছে এলো বটে, কিন্তু এতো কাছে নয় যে আরোহীদের চেহারা পরিষ্কার দেখা যায়। শেরাটনের সামনে ট্যাক্সি থামালো পিনেল, ক্যারেরা ফিফটি-ওয়ানে খালি একটা জায়গা দেখে ঢুকে পড়লো হোণ্ডা।

পরিস্থিতি যতোই বিরূপ হোক না কেন, সুবিধেজনক দু'একটা দিক সবসময় থাকে। যার ওপর নজর রাখা হয়েছে সে-ও কিছু সুবিধে ভোগ করে। পিনেলের সাথে কথা বলে ঠিক করে নিলো রানা আবার কখন কোথায় দেখা হবে ওদের, তারপর হোটেলে নাম লেখালো, এলিভেটরে চড়ে উঠে এলো পাঁচতলায়। এখানে লাগেজগুলো রাখলো ও। রুমসার্ভিসকে ডেকে কিছু পেসো সাধলো, বিনিময়ে জেনে নিলো সার্ভিস এলিভেটরটা কোন্‌দিকে। শেরাটন ভবন থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এলো পিছনের রাস্তায়। হোণ্ডার লোকগুলো যদি রুমসার্ভিসকে প্রশ্ন করে, জানতে পারবে তাদের সাবজেক্ট ফাঁকি দিয়েছে। আর যদি প্রশ্ন না করে, খালি একটা স্যুইট পাহারা দেবে তারা। দ্বিতীয়টা হলে ভালো হয়, ভাবলো রানা, কারণ ফেরার পর কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে রাখে ও।

প্লাজা দে বলিভার পর্যন্ত হেঁটে এলো রানা, সময় লাগলো পনেরো মিনিট। প্রতিপক্ষদের ব্যাক-আপ টিম থাকতেও পারে, এই আশংকায় সতর্কতা অবলম্বন না করলে সাত মিনিটে পৌঁছুতে পারতো ও। রেল-ওয়ের একটা কাউণ্টার থেকে রানঅ্যাওয়ে ট্রেন-এর টিকেট কিনলো, পাশের দোকান থেকে কিনলো বাদামি রঙের একটা হ্যাট—প্রথমটা থেকে বেরোবার সময় ইমার্জেন্সী এগজিট ব্যবহার করলো, দ্বিতীয়টা থেকে বেরোলো পিছনের দরজা দিয়ে। এরপর প্রায় সরল একটা পথ ধরে প্লাজা দে বলিভারে চলে এলো, যেখানে ওর জন্যে ট্যাক্সি নিয়ে

অপেক্ষা করছে পিনেল। রানা নিশ্চিত, কেউ ওকে ফলো করেনি।

প্লাজা খানিকটা দূরে থাকতেই হাঁটার গতি কমে গেল রানার, মুগ্ধ দৃষ্টি বোলালো চারদিকে। শিল্প শহর হিসেবে মেডিলিনের খ্যাতি আছে। শহরটা বিশেষ করে টেক্সটাইল, কেমিক্যাল আর ইস্পাতের জন্যে বিখ্যাত, অথচ চারদিকে কোথাও আবর্জনা বা নোংরামির চিহ্নমাত্র নেই। প্রধান রাস্তাগুলোর দু'ধারে ফুলের সরু বাগান। বাগানে কাগজের টুকরো তো দূরের কথা, ঝরা পাতা বা ফুলের পাপড়ি পর্যন্ত পড়ে নেই। ফুটপাতের মেঝে এতো মসৃণ যে একটু অসাবধান হলে আছাড় খেতে হবে। রাস্তার দু'পাশে দালান-কোঠা আধুনিক স্থাপত্যরীতির উদাহরণ। রানা অনুভব করলো, ওর পায়ে যেন স্প্রিঙ লাগানো আছে, কৃতিত্বটা প্রকৃতির—সাগর সমতল থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ও। মেডিলিনে কেউ বাস করতে চাইলে তাকে হয় কানে তুলো দিতে হবে, নয়তো বিরতিহীন গান-বাজনার ভক্ত হতে হবে। প্রায় প্রতিটি বাস বা মোটরের ভেতর জোরালো শব্দে রেডিও অথবা ক্যাসেট রেকর্ডার বাজছে। ঠাণ্ডা, নির্মল বাতাস। বছরের যে-কোনো সময় বসন্তের আমেজ পাওয়া যাবে। মেডিলিনকে সাধে কি আর 'সিটি অভ ইটারন্যাল স্প্রিঙ' বলা হয়।

সার সার পাম গাছ দিয়ে সাজানো প্লাজার পুবদিকে অপেক্ষা করছিল পিটার পিনেল। রানাকে দেখে কর্ন প্যানকেকের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে দিলো সে, একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে স্টার্ট নিলো অ্যান্টিক গাড়িটা। রানা চড়ে বসতেই বেল এয়ার নিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলো সে, এল পাবলাডো জেলার দিকে যাচ্ছে।

'শহরটা তুমি ভালো চেনো তো?'

রানার প্রশ্নের উত্তরে নিজেও হাসলো পিনেল, রানারও হাসির

খোরাক যোগালো, 'আমার স্ত্রীর মসৃণ নিতম্বে কোথায় তিল আছে যেমন জানি, তেমনি জানি শহরটার কোথায় ক'টা গলি আছে।' এর-পর শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলো সম্পর্কে ঝানু গাইডের মতো বর্ণনা দিতে শুরু করলো সে। নিজের শহর মেডিলিনকে নিয়ে গর্বিত পিনেল, প্রতিটি স্কাইস্ক্র্যাপারের সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ব্যাকুল, বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলোর নেপথ্যকাহিনী তার মুখস্থ, বিশাল প্রাঙ্গণ নিয়ে রাজপ্রাসাদতুল্য দালানগুলোয় কারা বস-বাস করে তা-ও তার জানা। সবশেষে আসল কথাটা বলতে ভুল হলো না তার, এ-সবই তৈরি হয়েছে নারকো-ডলারের বদৌলতে।

যেমন ধরা যাক সসার স্টেডিয়াম। এখানে যে-ক'টা টিম ফুটবল খেলে প্রায় সবগুলোই পরিচালনা করে কোকেন সম্রাটরা। মাঝে মধ্যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়, মেডিলিনের ড্রাগ কাপুদের টিম বোগোটা বা কালির ড্রাগ কাপুদের টিমের সাথে খেলে। বাজি ধরা হয় কোটি কোটি ডলার। খেলোয়াড়রা বোনাস হিসেবে ডলার বা সোনা পায় না, পায় কোকেন—পরিশোধিত কোকেন, আউন্স হিসেবে। রেফারিরা প্রায়ই আততায়ীদের হাতে খুন হয়ে যায়।

তবে মেডিলিনের আরেকটা পরিচয় 'সিটি অভ অর্কিডস'-ও বটে। দুর্লভ ফুলগুলো আবরা উপত্যকায় ঘাসের মতো বিপুল জন্মায়। শহর-তলীতে ঢোকার সময় রঙিন অর্কিড, বোগেনভিলিয়া আর জেসমিনের বিরতিহীন সৌন্দর্যের বিস্ফোরণ চোখ ধাঁধিয়ে দিলো—ওগুলো কোনো ঋতু মানে না, মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হলেই ফুটতে শুরু করে। দূরে, সার সার উঁচু বিল্ডিঙের পিছনে, আন্দেজের খাড়া প্রাচীর অকস্মাৎ, গভীর নীল ও এবড়োখেবড়ো, মাথাচাড়া দিয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

সুরক্ষিত একটা বাড়ির গেট পেরিয়ে গাড়ি-পথে ঢুকলো ট্যাক্সি।

বাড়ির চারদিকে পাঁচিলটা দশ ফুট উঁচু, তার ওপর কাঁটাতার। গাড়ি-পথের শেষ মাথায় লাল টালির ছাদ নিয়ে বিশাল বাড়িটা যে কোনো সৌখিন ও ধনী ব্যক্তির তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পান্না সবুজ লন। ম্লান গোলাপি মাটি। কৃত্রিম ঝর্ণার পানিতে সোনালি মাছ। গ্যারেজের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সুইডিশ গাড়িটা ঠিক যেন স্থির অগ্নিশিখা।

যদিও বিশেষ গুরুত্ব দিলো না রানা, কারণ আট হাজার ফুটের নিচে যে-কোনো উচ্চতায় কখনোই নিজের ভেতর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করে না ও, তবু অনুভূতিটা থাকলো—কেমন যেন স্থানচ্যুত লাগছে নিজেকে, গোড়ালিতে হালকা একটা অলস ভাব, নার্ভে যেন আঘাত পেয়েছে। কয়েক বছর আগে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ খাইয়ে আকাশে তুলে দেয়া হয়েছিল ওকে—বুদ্ধিহীন, বাচাল আর আতংকিত করার জন্যে। ককটেল পেটে পড়ার পর প্রথম দিকে ঠিক এরকম অনুভূতি হয়েছিল ওর—ভয়ের মৃদু অনুভূতি, যেন খুলি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে রঙগুলো, চোখের সামনে যা কিছু দেখছে কোনোটারই অর্থ পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

তবে দরজা খুলে ওর সামনে যিনি দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে শান্তি ও স্বস্তিবোধ করলো রানা। ভদ্রলোক অশীতিপর বৃদ্ধ হলেও কাঠামোটা পাঁচিলের মতো চওড়া। তাঁর নাম আলিজান আকরাম, প্রায় সত্তর বছর ধরে ভাগ্যের পরিহাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আপন মর্যাদায় আসীন আছেন। এককালে জার্মান নাগরিক ছিলেন, ছিলেন জার্মান ইহুদি, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হবে স্প্যানিশ। নাৎসীদের ভয়ে নয়, তাঁর ভাষায় 'চোখ খুলে যাওয়ায়', ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন—বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছর পর। গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়লেও, চামড়ার

রঙ এখনো উজ্জ্বল আর গাঢ়। সতর্কতার সাথে বাছাই করা মূল্যবান পোশাক পরেন ভদ্রলোক। মুখ ভর্তি সুন্দর করে ছাঁটা পাকা দাড়ি। সব মিলিয়ে অভিজাত ও পবিত্র একটা ভাব ফুটে আছে চেহারায়, দুটোর সম্মিলন প্রায় অসম্ভব বলে মনে হলেও। মুখ খোলার পর বোঝা গেল, তাঁর ভরাট গলায় এখনো যথেষ্ট জোর থাকলেও, সবিনয় কোমল সুরে কথা বলতেই অভ্যস্ত তিনি। 'মিঃ ওয়ারেন?'

রেলওয়ে কাউন্টার থেকে টিকেট কেনার সময় ফোনে এই নামটাই বলেছে রানা, ওর পাসপোর্টেও তাই লেখা আছে। 'জ্বী,' বললো ও। 'পল ওয়ারেন।'

'প্লিজ, কাম্ ইন।'

অনায়াস পদক্ষেপে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পিছু পিছু একটা অ্যানটিরুম হয়ে এগোলো রানা, ভেতরে কলম্বিয়া-পূর্ব যুগের মৃৎ আর ভাস্কর্য শিল্পের ছড়াছড়ি। লিভিংরুমে ঢোকার পর থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে, হালফ্যাশনের ফার্নিচার আর বিভিন্ন জাতের শিল্পকর্ম দিয়ে এমনভাবে সাজানো যে এরকম একটা জায়গায় উপস্থিত হতে পারার জন্যে প্রসন্ন বোধ না করে পারা যায় না। তৈলচিত্রগুলো আধুনিক, সম্ভবত দেশীয়, আর সোনালি মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকর্মগুলো নিঃসন্দেহে প্রাচীন যুগের প্রতিনিধিত্ব করছে। একদিকের গোটা দেয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে ব্রোঞ্জ আর সোনা দিয়ে তৈরি কাবা শরীফ। আরেকদিকে একটা চওড়া বেদী, তার ওপর সোনালি একটা নৌকো, নৌকায় বসে আছে সোনালি এক লোক।

'এল ডোরাডো,' বললেন আলিজান আকরাম, রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে সোনালি বেদীর দিকে তাকালেন। 'বুঝতে পারছি, ওটা তোমার মনোযোগ কেড়েছে।'

'জ্বী।'

'এল ডোরাডো বলতে আজকাল অনেক কিছু বোঝায়,' বললেন তিনি। 'অফুরন্ত গুপ্তধন নিয়ে কিংবদন্তীর এক শহর। অঢেল ঐশ্বর্যের একটা প্রতীক। কলম্বিয়া আর এল ডোরাডো এখন সমার্থক। তবে আসলে শব্দটার মানে করা হতো, সোনার মানুষ। মুইসকা ইণ্ডিয়ানরা তাদের সর্দারকে প্রথমে গাছের রস দিয়ে ভিজিয়ে নিতো, তারপর তাকে ঢেকে দিতো সোনার গুঁড়ো দিয়ে। একটা ভেলায় তুলে তাকে নিয়ে যাওয়া হতো লেকের মাঝখানে, ওখানেই ডুবে যেতো সে। তার শরীর থেকে ধুয়ে বেরিয়ে যেতো যে-টুকু সোনা, ওইটুকুই ছিলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে তাদের নিবেদন।'

'অনেকের কাছেই ব্যাপারটা অপচয় বলে মনে হবে, স্যার,' বললো রানা, তারপর নিজেই অবাক হলো—মেজর জেনারেল রাহাত খান ছাড়া আর কাউকে কখনো স্যার বলে সম্বোধন করেছে বলে মনে পড়ে না ওর।

'স্প্যানিশদের তাই মনে হয়েছিল,' নরম সুরে বললেন তিনি। 'আধুনিক যুগে যারা গুপ্তধনের সন্ধানে লেক গুয়াটাভিটা-র তলায় ডুব দিয়েছে, তাদেরও তাই ধারণা। তবে, সংস্কৃতি ও রীতির প্রতি সংবেদনশীল কোনো মানুষ তাদের সাথে একমত হবে না।'

'অবশ্যই।'

আলিজান আকরামের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখে মনে হলো তিনি জানেন তাঁর সাথে কৌতুক করা হয়েছে। ধীর ভঙ্গিতে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি, ট্রে হাতে উদয় হলো এক তরুণী। ট্রেতে দুটো কাপ আর একটা প্লেট দেখা গেল। কাপে সম্ভবত কফি, প্লেটটায় চাটনি ধরনের কিছু হবে। একটা টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রেখে যেমন

নিঃশব্দে ঢুকেছে তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

'এ-ও আরেকটা রীতি,' বৃদ্ধ বললেন। 'টিনটো। কোনো কাজই শুরু হবে না, সূচনা হবে না কোনো সম্পর্কের, যদি না এই কফি পরিবেশন করা হয়।'

শুরু করার অনুরোধটা রক্ষা করলো রানা। অত্যন্ত গাঢ় কফি, এতো ভালো ব্লেণ্ড-এর স্বাদ আগে কখনো পেয়েছে বলে মনে পড়লো না। প্রতিক্রিয়া হলো সাথে সাথে ; ড্রাগ-এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। 'লিলি, লিলিয়ানের মুখে আপনার নাম শুনে এসেছি আমি,' বললো ও। 'তার ধারণা, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

হাত দুটো প্রসারিত করলেন বৃদ্ধ, রানা লক্ষ্য করলো হাড়গুলো অত্যন্ত চওড়া হলেও মাংস ও চর্বি খুব কম। 'আমিও যে তাকে খুঁজছি, এটা সে জানতে পারে আমার এক ছাত্রের মুখে,' অন্যমনস্কভাবে বললেন তিনি, তাঁর চোখ দেখে রানার মনে হলো অতীতে ফিরে গেছেন ভদ্রলোক। 'লিলির বন্ধু, কাজেই তুমি আমার কাছে সাহায্য পাবে বলে আশা করতে পারো। কেমন আছে সে ?'

সাথে সাথে কিছু বললো না রানা, কারণ প্রশ্নটার সন্তোষজনক উত্তর দেয়া কঠিন। স্বদেশেই আছে সে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু বিদেশী একটা দূতাবাসে আত্মগোপন করতে হয়েছে তাকে। এমন কিছু তথ্য জানা আছে তার, প্রকাশ পেলে মার্কিন সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে, সেই সাথে বেরিয়ে পড়বে সি. আই. এ.-র কুৎসিত উলঙ্গ চেহারা।

'সে ভালো আছে, মিঃ আকরাম।'

'তুমি ঠিক জানো ?'

'আমি জানি সে নিরাপদে আছে,' বললো রানা। 'এর বেশি কিছু

বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুঃখিত, মিঃ আকরাম।'

রানা বুঝতে পারলো উত্তরটা পছন্দ হলো না ভদ্রলোকের, তবু ঝলমলে দাঁত বের করে হাসলেন তিনি। 'জানতে চাইছি এজন্যে যে মেয়েটাকে সত্যি খুব ভালোবাসি আমি। তুমি কি জানো, লিলির বাবা আমার বন্ধু ছিলো? যুদ্ধের আগে আমরা একসাথে লেখাপড়া করেছি।'

রানা যেমন চায়, সেদিকেই এগোচ্ছে আলোচনাটা। ভদ্রলোককে উৎসাহিত করার জন্যে বললো, 'জার্মেনীতে।'

'ম্যাথামেটিক্যাল ইনস্টিটিউট, গোটেনজেন-এ। আমরা একসাথে বেরিয়ে আসি, মার্টিন আর আমি। নাকি বলা উচিত, সে বেরিয়ে আসে? আমি তখন ইহুদি ছিলাম, পালিয়ে আসি।'

'তারমানে আগেই আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে...।'

'না, তা নয়,' গম্ভীর সুরে বললেন আলিজান আকরাম। 'নাৎসীরা ক্ষমতা পাবার প্রায় সাথে সাথেই ইউনিভার্সিটিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। সবাই বুঝতে পেরেছিল কি তাদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের আগেই হাজার হাজার ইহুদি জার্মেনী ছেড়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু সবার পক্ষে চলে আসা কি সম্ভব?' অনেকেই বিশ্বাস করতো না যে ফ্যাসিস্টরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। কিন্তু মার্টিন আমাকে বোঝায়। আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তার কাছে আমি ঋণী।'

সেই ঋণ পরিশোধ করেছেন আলিজান আকরাম। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করতেন দুই বন্ধু। আলিজান আকরাম অংকশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, কিন্তু প্রচারবিমুখ। বন্ধু মার্টিন শুধু তাঁর বন্ধু নন, ভক্তও বটেন। আলিজান আকরাম স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হলেন, তবু ইহুদি মার্টিন বেকার বন্ধুর প্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি হলেন

না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্ত্রীর চিঠি এলো, তিনি যদি কলম্বিয়া ছেড়ে নিউ-ইয়র্কে না আসেন, তাঁদের দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটাই সবদিক থেকে ভালো। চিঠির উত্তরে পাল্টা প্রস্তাব দিলেন মার্টিন বেকার, মেয়েকে নিয়ে তুমিই বরং মেডিলিনে চলে এসো। কিন্তু স্ত্রী এলেন না। বছর কয়েক পর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন ভদ্রলোক। খবর নিতে গিয়ে আলিজান আকরাম জানলেন, বন্ধুপত্নীরও মৃত্যু ঘটেছে কিছুদিন আগে। অনেক খোঁজ-খবর করেও বন্ধুকন্যার কোনো হদিশ বের করতে পারলেন না তিনি। অথচ বন্ধুর রেখে যাওয়া বেশ কিছু টাকা তাঁর কাছে রয়েছে। কথা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা তিনি জানিয়ে ছিলেন রাহাত খানকে।

এ-প্রসঙ্গে আলাপের সূত্র ধরে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের একটা দুর্লভ গুণের কথা জানতে পেরেছে রানা। ইনি না বললে কোনোদিনই ওর জানা হতো না যে অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রবল একটা শখ আছে তাঁর। অঙ্কশাস্ত্রে দুনিয়ার সেরা পণ্ডিতদের একজন আলিজান আকরাম, এ-কথা জানতে পেরে সুদূর বাংলাদেশ থেকে তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন তিনি। এরপরের ঘটনা রানা শুধু এইটুকু জানে যে ছাত্র হিসেবে আলিজান আকরাম রাহাত খানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন—আজও।

তারপর, রাহাত খানের সাথে লিলিয়ানের যোগাযোগ হলো কিভাবে, সে অন্য গল্প। তবে তাঁর পরামর্শেই আলিজান আকরামের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আসে লিলিয়ান। তখনই মার্টিন বেকারের গচ্ছিত টাকাগুলো লিলিয়ানের হাতে তুলে দেন ভদ্রলোক।

মেডিলিনের সবাইকে চেনেন আলিজান আকরাম, সেই সূত্রে শহর-টার সাথে লিলিয়ানের পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। সেই ঘটনারই

ফলশ্রুতি হলো ববি মুয়েলার-এর সাথে লিলিয়ানের বিয়ে, ববি মুয়েলারের মৃত্যু, মেক্সিকান দূতাবাসে লিলিয়ানের আশ্রয় প্রার্থনা।

'এখানে এসেই কি ববি মুয়েলারের খোঁজ-খবর করে লিলিয়ান?' জানতে চাইলো রানা। 'আপনাকে বলেছিল, ববি মুয়েলারের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে?'

'না,' মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'এলো তো একটা উন্মাদিনী। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতো। বিড় বিড় করে প্রলাপ বকতো। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতো না। অনেক কষ্টে তাকে আমি সুস্থ করি। কয়েক হপ্তা পর বাইরে বেরোতে শুরু করে সে। তারপর একদিন বললো, ববি মুয়েলারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায় কিনা। শুনে আমি অবাকই হয়েছিলাম।'

'কেন?'

'কারণ তার দুর্নাম সম্পর্কে কে না জানতো।' ক্ষমা প্রার্থনাসূচক হাসি দেখা গেল বৃদ্ধের ঠোঁটে। 'কলম্বিয়ার প্রমোদ শহর মেডিলিন, মিঃ ওয়ারেন। সমস্ত বেলেল্লাপনায় হাত পাকানো ছিলো ববি মুয়েলারের। এরকম একটা নষ্ট পুরুষের সাথে কেন লিলিয়ান পরিচিত হতে চায় বুঝতে পারলাম না। পরে আমি অনুমান করি, একটা প্ল্যান ধরে কাজ করছিল সে। প্ল্যানটা যে কি, আজও আমি তা জানতে পারিনি। তবে লিলিয়ান মুয়েলারকে বিয়ে করে ফেলায় সত্যি আমি আঘাত পাই। বিয়েটায় মুয়েলারের রাজি হওয়া আমার কাছে বিস্ময়কর লাগেনি। সে রাজি হলো, আমার ধারণা, একটিমাত্র কারণে—কলম্বিয়ার কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করতো না, অথচ তারও তো একটা পরিবার থাকা চাই।'

লিলিয়ানের প্ল্যানটা কি ছিলো, এখুনি তা বৃদ্ধকে জানানো উচিত

হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিলো রানা। তাঁর ছাত্র রাহাত খানের সাক্ষাৎ শিষ্য ও, এ-কথাটাও জানানোর কোনো প্রয়োজন দেখলো না। ববি মুয়েলারের কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার আশা নিয়ে নিজেকে এক রকম বলি দিয়েছিল লিলিয়ান, বিয়েটা ছিলো স্রেফ অভিনয়। তার অতি গোপনীয় প্ল্যান-এ আলিজান আকরাম ছিলেন একটা ধাপ বিশেষ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জানারই সুযোগ হয়নি কি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন তিনি।

'আপনি কি ববি মুয়েলারের বাবাকেও চিনতেন?'

'তাঁর সাথে আমার একবার মাত্র দেখা হয়েছে,' বৃদ্ধ বললেন। 'ছেলের বিয়েতে এসেছিলেন তিনি। ছেলেকে তো নয়ই, বিয়েটাও তিনি পছন্দ করতে পেরেছেন বলে মনে হয়নি। তবে পরে আমি জানতে পারি, অবিশ্বাস আর সংশয় তাঁর স্বভাবেরই একটা অংশ। নিঃসঙ্গ, একাকী থাকতে পছন্দ করেন।'

'কাউকা উপত্যকায় তাঁর নাকি একটা জায়গা আছে।'

'শুনেছি সেটা নাকি এক বিশাল ব্যাপার। রক্ষণশীল, প্রচণ্ড প্রতাপশালী হাসিনদাদো, মানে জমিদার, বলে মনে করা হয় তাঁকে। নিজের জমিতে তিনি কিছু কিছু কফি, ফল-ফলাদি, আখ ফলান; তবে আধুনিক অর্থে চাষবাস করেন না। তাঁকে আপনি ভদ্রলোক কৃষক বলতে পারেন। শুধু ইণ্ডিয়ানরা তাঁর কাজ করে। দেখে শুনে মনে হয়, স্থানীয় গোত্রগুলোর সাথে তাঁর বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। সব মিলিয়ে, আগেকার দিনের জমিদারদের বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বজায় রাখার চেষ্টা করেন।'

'একটা ডিসটিলারির মালিক, শুনেছি,' বললো রানা।

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন আলিজান আকরাম। 'রমরমা ব্যবসা

করে ওটা। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে শুধু ওটা নয়, আরো বেশ কয়েকটা ডিসটিলারি চালু করা হয়। তার আগে কলম্বিয়ার সব জায়গায় ছোটো ছোটো মদ চোলাই করার কারখানা ছিলো। স্থানীয় মদ 'চিচা' তৈরি সাধারণ মানুষের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আইনটা পাস হবার পর বড় কমার্শিয়াল ফার্মগুলো বাজারে ঢোকার পথ পেয়ে গেল।'

রানা জানে, প্রায় ওই সময়েই কলম্বিয়ায় পৌঁচেছেন রলফ মুয়েলার। সময় আর সুযোগ, দুটোর সংযোগ লক্ষ্য করে মনে মনে উৎসাহিত বোধ করলো ও। 'তিনি কি ডাচ?'

'নামটা ডাচ,' বললেন আলিজান আকরাম।

'তারমানে কি আপনি বলতে চান রলফ মুয়েলার ডাচ নন?'

'আমি বলতে চাই তিনি স্প্যানিশ বলেন জার্মান সুরে,' জোর দিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'ঠিক জার্মান নয়, বাভারিয়ান সুরে।'

'ধরে নেয়া চলে কি যে তিনি মিউনিক থেকে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা, জানে শতাব্দীর সূচনালগ্নে ওর শিকার ওই শহরেই জন্মেছে।

'সম্ভাবনা আছে,' আলিজান আকরাম বললেন। 'ভালো সম্ভাবনা আছে।'

'একজন জার্মান কেন নিজেকে ডাচ বলে পরিচয় দেবে, যদি না তার লুকোবার কিছু থাকে?'

'ভাষা ও জাতিগত মিল আছে, এটা একটা কারণ হতে পারে। আরেকটা কারণ হতে পারে, ডাচ কলোনি সুরিনাম কাছেই।'

'কাভার হিসেবে ভালো,' বললো রানা। 'সুরিনাম থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করা, ধরে নেয়া যায় কঠিন হয়নি।'

'সম্ভব। পরিচয় গোপন করা দরকার, সাথে টাকা থাকলে অসুবিধে কি।'

'তাহলে তিনি নিজের যে পরিচয় দিচ্ছেন সেটা সত্যি নয়,' বললো রানা। 'যথেষ্ট টাকা নিয়ে পৌঁছুলেন, ভদ্র কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে, ভাগ্যগুণে তাঁর আখ থেকে বেরিয়ে আসা রস গোটা কলম্বিয়ায় বাজার পেয়ে গেল। নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিলেন, নিজের পরিচয় দিলেন রলফ মুয়েলার বলে। আমি যেন একটা ফেরারী আসামীর আদল দেখতে পাচ্ছি।'

কিন্তু রানার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে এখুনি প্রস্তুত নন আলিজান আকরাম। 'অচেনা একটা দেশে এসে সেখানকার কালচারকে গ্রহণ করতে না পারাটা নতুন কিছু নয়। তাঁর কথায় জার্মান টান, এটারও অনেক কারণ থাকতে পারে। আসলেই তিনি হয়তো একজন ডাচম্যান, জন্মেছেন জার্মেনীতে। এমনও হতে পারে যে জার্মানভাষী কোনো পরিবারে মানুষ হয়েছেন। মুয়েলার এমন একটা সাধারণ নাম যা নানাভাবেই সীমান্ত পেরোতে পারে। ইংরেজিতে ওটা মিলার, জানো তো।'

'আর জার্মেনীতে—মুলার।'

চেহারায় কৌতূহল নিয়ে রানার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ, যেন সাড়া দিতে চান, তবে তার আগে খানিক চিন্তা করবেন। শার্টের পকেটে চাপড় দিলেন তিনি, একটা ডানহিল বের করে ধরালেন। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, বুঝলে। মনে পড়ছে এ-বিষয়ে লিলির সাথেও কথা হয়েছে আমার। তুমি যেন ঠিক তার ভাষায় কথা বলছো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'হতে পারে আমাদের চিন্তাধারা এক।'

আলিজান আকরামের ঠোঁটের চারপাশে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে

থাকলো খানিকটা ধোঁয়া। 'কিংবা হয়তো তোমরা একই ধরনের ট্রেনিং পেয়েছো।'

রানা কিছু বললো না।

'ভুল বুঝো না, মিঃ ওয়ারেন। যা আমার জানার প্রয়োজন নেই তা আমি জানতে চাইছি না। তবে এ-কথা ভুলতে পারি না যে মার্টিন বেকার কলম্বিয়ায় স্থায়ীভাবে বাস করলেও, একটা মার্কিন সংস্থার হয়ে মাঝে-মধ্যে কাজ করতো। পরে জানতে পেরেছি, তার মেয়ে লিলিও সেই একই সংস্থায় নাম লিখিয়েছে। তুমিও সেই একই সংস্থার কর্মী হলে আমি একটুও অবাক হবো না।'

'এখানে আপনার ভুল হচ্ছে,' বললো রানা। 'আমি আমেরিকান কোনো সংস্থার কেউ নই। তবে, লিলির মতো আমিও ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে আছি। লিলি যে সংস্থায় আছে...ছিলো, আমি সেটার বিরুদ্ধে কাজ করছি—অন্য একটা মার্কিন সংস্থার অনুরোধে। ব্যাপারটা বেশ জটিল, তাছাড়া প্রকাশ করার মতোও নয়। আপনাকে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে, আপনার একজন ছাত্রের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ পাচ্ছি আমরা দু'জনেই—আমি ও লিলি।'

'আমার ছাত্র? কার কথা বলছো তুমি?'

'রাহাত খান।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন আলিজান আকরাম। খানিক পর তিনি শুধু বললেন, 'তার সাথে আমার তাহলে কথা বলতে হবে।'

'তিনিও সম্ভবত তাই আশা করছেন।'

আরো খানিক চিন্তা করে বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, 'লিলির নিরাপত্তার কথা ভেবে আমার জানতে ইচ্ছে করছে, সে কি পালিয়ে আছে? যদি

থাকে. কার কাছ থেকে ?'

সরাসরি জবাব দেয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে রানা বললো, 'শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার কাছ থেকে নয়।'

'তার সাথে তোমার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে? যদি থাকে, কবে?'

'আপাততঃ আমি কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।'

'হুম।' তারমানে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না আলিজান আকরাম।

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'লিলিয়ান তার সংস্থার হয়ে কাজ করতে গিয়ে এমন কিছু তথ্য পেয়ে যায়, সে বুঝতে পারে সংস্থাটা তার নিজ দেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। দেশকে ভালোবাসে সে, কাজেই সংস্থাটির এই হঠকারী আচরণ মেনে নিতে পারে না। মরিয়া হয়ে কলম্বিয়ায়, আপনার কাছে চলে আসে লিলি—নিজের সংস্থার বিরুদ্ধে আরো অকাট্য তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে। আপনার কাছে আসার পিছনে আরো একটা কারণ ছিলো তার। রলফ মুয়েলারের আসল পরিচয় জানা। যখন তার বিশ্বাস হয় যে লোকটার আসল পরিচয় জানতে পেরেছে, দেরি না করে তার ছেলে ববি মুয়েলারকে বিয়ে করে ফেলে সে, তাকে নিজের সংস্থার সদস্য করে নেয়, তারপর ওই সংস্থার কিছু বিপথগামী অফিসারের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করার জন্যে তাকে একটা অপারেশনে ব্যবহার করে,' থামলো রানা, ভাবলো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু বলা হয়ে গেল কিনা।

আধ খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন আলিজান আকরাম। 'রলফ মুয়েলার সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করা কি আমার জন্যে নিষেধ?'

'বিপজ্জনক হতে পারে,' বললো রানা।

'বিপদ,' বললেন বৃদ্ধ। 'এই বয়সে। মিঃ ওয়ারেন, তুমি কি জানো না, যুদ্ধের সময় কি ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ভেতর টিকে থাকতে হয়েছে আমাকে? আমার তো যুদ্ধের সময়ই মরে যাওয়ার কথা ছিলো। বেঁচে আছি ধার করা সময় নিয়ে।'

'সময়টা আপনি কার কাছে ধার করেছেন, মনে করুন তো,' শান্ত স্বরে আহ্বান জানালো রানা।

দাড়িতে হাত বোলালেন আলিজান আকরাম। 'ঠিক কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি না।'

'শুনুন তাহলে,' বললো রানা। 'আমাদের ধারণা, রলফ মুয়েলার আসলে একজন নাৎসী ফেরারী। তাঁর আসল নাম হেনেরিক মুলার। জার্মান গেস্টাপোর প্রধান ছিলেন তিনি।'

তিন

'হেনেরিক,' বললেন আলিজান আকরাম, জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন ফুলফোটা বাগানে। 'তার প্রথম নামটা জার্মেনীতে খুব কম লোকই জানতো। গেস্টাপো মুলার হিসেবেই তাকে চিনতো সবাই। দুনিয়ার আর কোনো ব্যক্তির নাম তার প্রতিষ্ঠানের সমার্থক হয়ে উঠতে

পারেছে কিনা আমার জানা নেই।'

'পণ্ডিতদের সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর,' বললো রানা। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁকে রাশিয়ায় পাঠানো হয় সোভিয়েত সিক্রেট পুলিশের সাথে কাজ করার জন্যে। আপনি তো জানেনই, বিশের দশকে জার্মান আর রাশিয়ানদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিলো। নিষেধাজ্ঞা থাকায় জার্মেনী তার নিজের সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারেনি, তাই গোপনে তারা প্লেন, যুদ্ধজাহাজ, পয়জন গ্যাস ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে রাশিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করে। বিনিময়ে জার্মেনী টাকা আর অফিসার পাঠাতো রাশিয়ায়। বলা হতো, অফিসাররা শিক্ষাদান করতে গেছে, কিন্তু কিছু লোক, যেমন মুলার, গিয়েছিল শিখতে।'

'অথচ জার্মেনীতে কমিউনিস্টদের বারোটা বাজিয়ে দেয় লোকটা,' বললেন আলিজান আকরাম।

'পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোয় তাঁর জুড়ি নেই,' বললো রানা। 'কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য, যোগাযোগ আর ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে যে ব্যক্তি সব জানেন, তাঁর পক্ষেই তো তাদেরকে ধ্বংস করা সবচেয়ে সহজ।'

'চরম সুযোগ সন্ধানী,' বললেন বৃদ্ধ। 'আ সারভাইভার।'

তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত হলো রানা। হেনেরিক মুলার বেঁচে আছেন, আছেন এই কলম্বিয়াতেই, শোনার পর রাগ নয়, কৌতূহল প্রকাশ করলেন আলিজান আকরাম। তথ্যগুলো কোত্থেকে পেয়েছে রানা?

আসলে মুলারের বেঁচে থাকার গল্পটা বিশ্বাস করতে পারছেন না বৃদ্ধ। নাৎসী ফেরারীদের সম্পর্কে হাজারো সস্তা গল্প শোনা যায়

দক্ষিণ আমেরিকায়। তবে, মার্টিন বেকার আর তাঁর মেয়ে লিলিয়ান বেকারের প্রতি আস্থা আছে ভদ্রলোকের।

মার্টিন বেকার একজন ইণ্টেলিজেন্স অফিসার ছিলেন, বার্লিন থেকে মুলার পালিয়েছেন এই খবরটা প্রথম তাঁর কাছেই পৌঁছায়। যুদ্ধের পর অন্য এক চেহারা নিয়ে মুলার আর্জেন্টিনায় এসেছেন, এ-ধরনের একটা রিপোর্ট এফ. বি. আই.-ও তৈরি করেছিল। সেখান থেকে কলম্বিয়ায় কিভাবে এলেন তিনি, সে-সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে, আলিজান আকরামকে একটা ফটোর কথা বললো রানা, সম্প্রতি তোলা হয়েছে। সেই ফটোর সাথে জার্মেনীতে তোলা মুলারের ফটো মিলিয়ে দেখা হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন দুটো ফটো একই লোকের হতে পারে, না-ও হতে পারে। কেউ যদি তার চেহারা সার্জিক্যাল অপারেশনের সাহায্যে বদলাতে চায়, চেহারার সবটুকু বদলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে-অংশগুলো বদলানো সম্ভব নয়, দুটো ফটোতে সেগুলো একইরকম লেগেছে।

'আমার ধারণা,' বললো রানা, 'রলফ মুয়েলারই হেনেরিক মুলার। লিলিরও তাই ধারণা। তবে, তথ্য-প্রমাণ অকাট্য নয়। তাঁর বিরুদ্ধে লাগার আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।'

'সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য তুমি আমার কাছ থেকে পাবে,' কথা দিলেন আলিজান আকরাম, তবে শর্তহীন নয়। 'কিন্তু আমাকে জানতে হবে, তুমি একজন বিদেশী হয়ে মার্কিন একটা সংস্থাকে সাহায্য করছো কেন? তুমি বললে, অন্য একটা মার্কিন সংস্থার বিরুদ্ধে কাজ করছো। তাছাড়া, গেস্টাপো মুলারকে ধরার জন্যে তোমার গরজের পেছনে আসল কারণটাই বা কি?'

উত্তর দিতে না চাইলেও, রানা বুঝতে পারলো এখন আর মুখ না

খুলে উপায় নেই। 'ববি মুয়েলারকে আমি খুন করেছি, স্যার। ব্যাপারটা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিলো, তা নয়। ববি মুয়েলারের বাবা যদি হেনেরিক মুলার হন, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না তিনি। কাজেই রলফ মুয়েলারকে—মুলারকে—অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে আমার। তাঁকে অকেজো করা না গেলে আমি বা লিলি নিরাপদ নই।' আলিজান আকরামকে কতোটুকু কি বলা যায় ভাবতে গিয়ে অতীতে ফিরে গেল রানা।

সমস্যাটা অকস্মাৎ দেখা দেয়। চোরাপথে হেরোইন আসছিল বাংলাদেশে, কিন্তু কোকেন আসার কোনো খবর ইন্টেলিজেন্স মহলে ছিলো না। তারপর এক মাস আগে হঠাৎ করে কোকেনের তিনটে চালান ধরা পড়লো জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। তদন্ত করতে গিয়ে জানা গেল, গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল আর পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশে হু হু করে ঢুকছে কলম্বিয়ার পরিশোধিত কোকেন।

প্রায় একই সময়ে রবিন নামে এক রুশ এজেন্টের সাহায্য চেয়ে সি. আই. এ. এজেন্ট লিলিয়ানের একটা বার্তা পৌঁছুলো কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টার মস্কোয়। কে. জি. বি.-র হয়ে একবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল রানা, তখনই লিলির সাথে ওর পরিচয়। রবিন ওরফে রানাকে ভালোবেসে ফেললেও, ওকে রুশ এজেন্ট মনে করে বিষণ্ণ মনে বিদায় দেয় লিলি।

বিপদে দিশেহারা হয়ে রানার খোঁজে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করলেও, কে. জি. বি. কর্তৃপক্ষের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি সে। অগত্যা বাধ্য হয়ে রানার আসল পরিচয় ও ঠিকানা লিলিকে জানিয়ে দেয় ওরা। রানা তখন ঢাকায় ছিলো না, লিলিয়ানের সাথে টেলিফোনে কথা বললেন বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসর-

প্রাপ্ত) রাহাত খান।

লিলির মুখ থেকে রাহাত খান জানতে পারলেন, সি. আই. এ. এমন কিছু রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করছে যা প্রকাশ পেলে দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে আমেরিকাবাসীরা। লিলি তাঁকে আরো জানালো, গেস্টাপো চীফ হেনেরিক মুলার বহাল তবিয়তে কলম্বিয়ায় বেঁচে আছেন। তাঁকে ধরার জন্যে, সেই সাথে সি. আই. এ.-র ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আরো প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে রানার সাহায্য তার দরকার।

ঢাকা থেকে সব কথা জানানো হলো রানাকে। রানা তখন ওয়া-শিংটন ডি. সি.-তে বসে একই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে যুক্ত-রাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির চীফ হুবার্ট লজের সাথে। সি. আই. এ. ও এন. এস. এ.-র মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি নতুন নয়, সি. আই. এ.-র কুকীর্তি সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট পেয়ে অকাট্য তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে কি করা যায় ভাবছিলেন হুবার্ট লজ। রানাকে ডেকে ওর সাহায্য চাইলেন তিনি, কারণ সি. আই. এ.-র পিছনে লাগা আরেকটা মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের পক্ষে নানা কারণেই সম্ভব নয়।

পুরোটা নয়, কাহিনীর অংশবিশেষ সংক্ষেপে আলিজান আকরামকে জানালো রানা। তবে স্বীকার করতে হলো, বি. সি. আই.-এর একজন এজেন্ট ও, রাহাত খানের সাক্ষাৎ শিষ্য। তাঁর নির্দেশেই কলম্বিয়ার কোকেন সম্রাটদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এখানে এসেছে। সেই সাথে রলফ মুয়েলারের ছদ্ম পরিচয় উন্মোচনের দায়িত্বও রয়েছে ওর কাঁধে। লিলিয়ানের সাথে কোথায়, কিভাবে ওর পরিচয় হয়েছিল সে-প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল *। এড়িয়ে গেল ববি মুয়েলারের

* শান্তিদূত, ১/২ দ্রষ্টব্য।

খুন হওয়ার ঘটনাটা। এই মুহূর্তে লিলি কোথায় আছে তাও বললো না।

'আমি কি তাহলে ধরে নেবো, তুমি মার্কিন সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমতি ছাড়াই অ্যাসাইনমেন্টটায় কাজ করছো?' জানতে চাইলেন আলিজান আকরাম।

এন. এস. এ.-র চীফ হুবার্ট লজ বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে কাজটা করে দেবে রানা, অফিশিয়াল কোনো ব্যাপার নয়। রানা বিপদে বা ধরা পড়লে, এন. এস. এ. ওর সাথে সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে। 'জ্বী,' সংক্ষেপে বললো রানা।

'এটা তাহলে, আমাকে বুঝতে হবে, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একটা কাজ।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'জ্বী।'

'তবে, লিলিকে তুমি সাহায্য করছো।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'ভেরি গুড,' বললেন আলিজান আকরাম। 'কি দরকার তোমার? বলে ফেলো, আমার কাছে কি চাও তুমি। তবে সাবধানে চাইবে, কারণ যা চাইবে তাই পাবে তুমি।'

ওর চাহিদার একটা তালিকা পেশ করলো রানা। মুলার সম্পর্কে নিরেট তথ্য পাবার আশা নিয়ে এসেছে ও, ওর আশা পূরণ না হলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা জানতে পেরেছে তার গুরুত্ব কম নয়; বড় কথা হলো আরো ব্যাপক সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ও। যোগাযোগ ও জরুরী মেডিকেল সহায়তা পাবার ব্যাপারে আলিজান আকরামের ওপর ভরসা করা যায়, মুলারের অতীত ও বর্তমান নিয়ে ওর গবেষণাতে আরো অবদান রাখতে পারবেন তিনি।

এমন একটা অবস্থানে রয়েছেন ভদ্রলোক, রানার চাহিদা পূরণ করা তাঁর জন্যে কঠিন হবে না। তিনি শুধু মার্টিন বেকারের সাবেক বন্ধুই নন, বা তাঁর একমাত্র পরিচয় এটা নয় যে তিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, সেই সাথে বিরাট একটা ইলেকট্রনিক কোম্পানীর মালিকও বটেন, বিভিন্ন সরকারী ডিপার্টমেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন, সেগুলোর মধ্যে ডি. এ. এস.-ও ছিলো—জাতীয় পুলিশ বিভাগের সমমান সম্পন্ন একটা সংস্থা।

মনে মনে একটা আশংকা ছিলো রানার, সেটা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। ইহুদি ধর্মের নিন্দা বা ইসলাম ধর্মের প্রশংসা, কোনোটাই করেননি আলিজান আকরাম। সেজন্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করলো ও। তাঁকে যে বিশ্বাস করা যায়, এ-ব্যাপারেও ওর মনে কোনো সন্দেহ নেই। হেনেরিক মুলার বা নাৎসী অফিসাররা যে অপরাধী, তাদের যে বিচার হওয়া দরকার, এ-ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন না।

হেনেরিক মুলার অপরাধী, এটা ছাড়াও অন্য একটা কারণে তাঁকে ধরার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রানা। কারণটার সাথে স্বদেশের স্বার্থ জড়িত। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির হুবার্ট লজ কথা দিয়েছেন, হেনেরিক মুলারকে রানা ধরে দিতে পারলে বাংলাদেশে কলম্বিয়ার কোকেন চালান দেয়ার পথগুলো বন্ধ করার জন্যে সম্ভাব্য সব সাহায্য করবেন তিনি। কলম্বিয়ায় এন. এস. এ.-র তেমন কোনো ভূমিকা নেই, মার্কিন সরকারের যে বাহুটি এখানে খানিকটা সচল তার নাম ডি. ই. এ. ---ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—হুবার্ট লজ তাগাদা দিলে পথগুলো বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা হতে পারে। এ-ব্যাপারে বন্ধু টমাস কালভিনের সাথেও কথা হয়েছে রানার। কালভিন ডি. ই. এ.-র একজন এজেন্ট।

হুবার্ট লজ ওকে জানিয়েছেন, শেষ পর্যায়ে তাঁর সংস্থা ওকে সাহায্য করবে, যদি দরকার হয়। হেনেরিক মুলারকে আটক করে খবর পাঠালে দু'ঘণ্টার মধ্যে রানার নির্দেশিত জায়গায় একটা হেলিকপ্টার সহ পাঁচ-জন সশস্ত্র লোক পৌঁছে যাবে।

সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কালভিনও। যুক্তরাষ্ট্রে গোছানো একটা ফিল্ড কিট ডিপ্লোম্যাটিক কুরিয়ার হয়ে কলম্বিয়ায় পৌঁছে যাবে।

আলিজান আকরামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিটার পিনেলকে নির্দেশ দিলো রানা, 'ক্যারেরা বাহান্নতে চলো, তোমাদের চিড়িয়াখানাটা দেখে আসি।'

বৈচিত্র্য ও সংখ্যার দিক থেকে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীকুল নগণ্য নয়। সান্তা ফে চিড়িয়াখানায় উপমহাদেশের প্রায় সব প্রাণীরই ঠাঁই মিলেছে, এমন কি প্রায় অবলুপ্ত কিছু নমুনাও চোখে পড়লো। শুনে রোমাঞ্চিত হলো রানা, একটা পাহাড়ের পাথুরে ঢালে, ছোট্ট এক পেন-এ, স্থানীয় খয়েরি ভালুকের গোটা একটা পরিবার বাস করে। খাঁচাগুলোর সামনে নোটিশ টাঙানো আছে, প্রাণীদের খাবার দেয়া বা আদর করা নিষেধ, ওগুলোর পিছনে খোস-পাঁচড়ার দাগগুলোকে মারাত্মক রোগ মনে করার কোনো কারণ নেই।

ঘুরে ফিরে দেখছে রানা, বড় একটা ব্যাগ হাতে ওর পিছু নিলো এক মার্কিন যুবক। রানার সমান লম্বা সে, তবে একটু বেশি রোগা, পরনের বিজনেস স্যুটটা বেশ দামী, তবে স্থানীয় দোকান থেকে কেনা। স্প্যানিশ ভাষায় রানার সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলো সে। ভাষাটার ওপর তার তেমন দখল নেই, অন্তত রানার চেয়ে ভালো নয়।

'ইংরেজি বলো,' বললো রানা, পরিচিতিমূলক সংকেত বিনিময়ের পর। 'তা না হলে লোকের নজর কাড়া হবে।'

বয়স হবে পঁচিশ, রানার কথায় রীতিমতো অপমান বোধ করলো লোকটা। 'এই কেয়ার প্যাকেটটা নিয়ে এখানে আমাকে আসতে বলা হয়েছে,' ঝাঁঝের সাথে বললো সে। 'আমার ওপর আর কোনো নির্দেশ নেই।'

কেয়ার শব্দটা উচ্চারণ করায় লোকটার ওপর অসন্তুষ্ট হলো রানা, ভাবটা যেন ব্যাগের ভেতর কি আছে সে জানে। আরো একটা জিনিস খারাপ লাগলো ওর, সে তার নাম বলেনি। এমনকি একটা ছদ্মনামও তো থাকবে। 'কি বলে ডাকা হয় তোমাকে, বাছা?'

'জ্যাক—জ্যাক মরিস। আর প্রমাণ করতে না পারলে দয়া করে আমাকে বাছা বলবেন না, আমি আপনার সন্তান নই।'

'শোনো, মরিস, তোমাকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই না। আমার দরকার কিছু তথ্য। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই আমার পিছু নিলো একটা হোণ্ডা। ওরা কি ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির লোক?'

ছোটো হলেও, শব্দ করে হাসলো জ্যাক মরিস, কিন্তু রানার কানে কৃত্রিম লাগলো। শুধু হাসিটা নয়, মাথার চুলে তার হাত বোলানোর ভঙ্গিটাতেও নার্ভাস একটা ভাব রয়েছে। 'আরে সাহেব, আপনি জানেন না এখানে কি ঘটছে? ড্রাগ ব্যবসায়ীদের বিচার করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হবে, কলম্বিয়া সরকারকে এই প্রস্তাব দেয়ার পর থেকে আক্ষরিক অর্থেই আমাদেরকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে। বুঝতে পারছেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছি আমরা? মার খাচ্ছি সংখ্যাতে, ওদের এক হাজার লোককে ঠেকাতে আমরা একজনের বেশি লোক

দিতে পারছি না। বোগোটায় কি হচ্ছে শুনেছেন? দূতাবাসের লোকেরা অফিসে আসা-যাওয়া করছে আর্মারড্ কনভয় নিয়ে। আমেরিকানদের পোষ্যরা সবাই দেশে ফিরে গেছে, কিংবা ফিরে যাবার পথে রয়েছে। আরো শুনতে চান? খোদ অ্যামব্যাসাডর গত বছর ক্রিস্টমাসের ছুটিতে দেশে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তিনি এখানে নেই, তাই দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে মনে করা হচ্ছে তাকে। মেডিলিনে ডি. ই. এ.-র এখন আর কোনো অফিস পর্যন্ত নেই, কারণ পরিচয় প্রকাশ করাটা ভয়ানক বিপজ্জনক। আপনাকে অনুসরণ করা আমাদের জন্যে বিলাসিতা, বুঝলেন? এখানে আসার পথে সম্ভাব্য ফেউ খসাবার জন্যে দেড়টি ঘণ্টা ব্যয় করেছি আমি।'

ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির শক্তি কমে গেছে, সেজন্যে উদ্বিগ্ন নয় রানা, অস্বস্তিবোধ করলো বিনা চ্যালেঞ্জে একদল ড্রাগ ব্যবসায়ী গোটা একটা দেশকে আতংকিত করে রেখেছে বুঝতে পেরে। 'লোকগুলোকে ধরে জেলে ভরা হচ্ছে না কেন?'

হঠাৎ বিহ্বল দেখালো মরিসকে, ধারণাটা যেন আনকোরা নতুন বা বৈপ্লবিক। বেবি-সিটারে বাচ্চাকে নিয়ে এক মহিলা এগিয়ে আসছে দেখে জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো মরিস, রানা বুঝলো তার প্রতিক্রিয়ার অর্থ করতে ভুল হয়েছে ওর। লোকটা সতর্ক থাকতে চাইছে। শুধু সতর্ক নয়, সন্ত্রস্ত বলেও মনে হলো তাকে। ভালুকগুলোর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো সে, তার পিছু নিলো রানা।

'কলম্বিয়ার একজন বিচারক আমাকে একবার কি বলেছিলেন জানেন?' চাপাস্বরে, নিঃশ্বাসের সাথে বললো মরিস। 'ওরা টাকা সাধলে সেটা তোমাকে নিতে হবে, তা না হলে মরতে হবে।

কাউকে যদি জেলে পাঠাও, টাকা দিয়ে ঠিকই বেরিয়ে আসবে সে। হোসে ম্যাটা বালেসটেরোসকে বোগোটায় জেলে ভরলো সরকার। ঠিক হলো, বিচারের জন্যে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে। এরপর কি ঘটলো ? প্রথমে ওরা খুন করলো লা পিকোটা জেলের প্রিজন ওয়ার্ডেনকে, কারণ ঘুষ খেতে রাজি হননি তিনি। মোটরসাইকেলে চড়ে একদল আততায়ী এসে কাজটা করে গেল। যাবার আগে কারারক্ষীদের মধ্যে বিলি করলো টাকা—এখানে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার কথা বলছি—তালা দেয়া সাতটা গেট খুলে গেল, হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো হোসে। গত মার্চের ঘটনা।'

প্রভাবিত হলো রানা। কলম্বিয়ার অপরাধীরা ক্ষমতা রাখে। তবে ক্ষমতাধরদের ঘায়েল করার মতো শক্তিও সব সময় থাকে। 'পাল্টা ওদেরকে খুন করার কোনো চেষ্টা সরকারের তরফ থেকে হয়নি ?'

'অতো সহজ ভাববেন না,' বললো মরিস। 'আপনি উদ্যোগ নিলে নিজের মরণ ডেকে আনবেন। একশো ডলার ভাড়ায় খুনি পাওয়া যায় মেডিলিনে। চাইলে আপনাকে রসিদও দেয়া হবে। কাজ না হলে টাকা ফেরত পাবেন। ব্যর্থ হলে, আবার চেষ্টা করবে ওরা, যতোক্ষণ আলোচ্য ব্যক্তি খুন না হয়। আপনার যদি টাকার অভাব না হয়, আপনার শত্রুর তালিকা যতো লম্বাই হোক, সব ক'টাকে পরপারে পাঠাতে পারবেন।'

'এতোই সস্তা এখানে মানুষের জীবন ?'

আড়ষ্ট, ব্যঙ্গাত্মক হাসি দেখা গেল মরিসের ঠোঁটে। 'কলম্বিয়ানদের কাগজের কাপ বলে ওরা। একবার ব্যবহার করে ফেলে দাও।'

'গলদটা তাহলে এখানেই,' বললো রানা, আরো ভীতিকর দুর্নীতি

ও সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আছে ওর। ‘সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সচেতন নয়। তারা রুখে দাঁড়ালে পরিস্থিতি এতোটা খারাপ হতে পারতো না।’

‘আপনার উপদেশ একটা কাগজে লিখে ফেলুন, তারপর সেটা ছুঁড়ে দিন সরকারের নাক লক্ষ্য করে। আপনার মতো উপদেষ্টা দরকার ওদের।’

কেন যেন হাসি পেলো রানার, বয়স বেশি না হলেও মানব চরিত্র সম্পর্কে সবজান্তা একটা ভাব নিয়ে দিব্যি সুখে আছে ছোকরা। এই মুহূর্তে ওরা যদি সাপের ঘরে উপস্থিত না থাকতো, তাহলে হয়তো তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক সম্পর্কে জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো রানা। চারদিকে কাঁচের বাক্স। ভেতরে সাপ। সাপগুলোকে দেখে মরিসের চোখ উত্তেজনায় চকচক করে উঠলো। একটা বাক্সের সামনে থামলো সে, লেবেল দেখে জানা গেল ভেতরের সাপগুলো বুশমাস্টার।

‘দেখুন-দেখুন,’ একটা সাপের দিকে হাত তুলে, মুগ্ধ-বিস্ময় গোপন না করেই বললো মরিস। ‘দশ থেকে বারো ফুট লম্বা হতে পারে ওগুলো। বিষটা তো মারাত্মকই, যতো বড় হবে আকারে ততোই বিপজ্জনক হবে কামড়গুলো। ভীতিকর ব্যাপারটা কি জানেন? ওগুলো আপনাকে ধাওয়া করবে।’

রানার মনে হলো, তার কথা বা ভাবের মধ্যে না থাকলেও অন্য কি যেন একটা বলতে চাইছে সে। মেসেজটা যা-ই হোক, সেটা দেয়ার জন্যে অস্থির, ব্যাকুল হয়ে আছে। ‘ফিল্ডে খুব বেশি দিন ধরে রয়েছো তুমি, মরিস,’ শান্ত গলায় মন্তব্য করলো ও।

‘আছি এক বছর হলো,’ বললো মরিস। ‘আমার বয়স সাতাশ, পা

দিতে যাচ্ছি অষ্টাশিতে। তবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই এই বলে যে কপালটা আরো খারাপ হতে পারতো। আমাকে বোগোটায় পাঠানো হলে কি করার ছিলো ? ওখানে চব্বিশ ঘণ্টা বৃষ্টি হয়।'

'আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি, মরিস। আমি বলতে চাইছি, এই পেশা ছেড়ে দেয়া উচিত তোমার। যারা ভালোবাসে শুধু তাদেরকেই মানায় এটা। অল্প কিছু লোক ভালোবাসে এটাকে, সাধারণত তারা এক ধরনের পাগলাটে স্বভাবের হয়।'

দ্রুত, কণ্ঠে বিদ্রূপ নিয়ে জবাব দিলো মরিস, 'কথাটা বলায় আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আজ রাতে বিছানায় উঠে ওটা নিয়েই ভাববো। আমাদের কাজ শেষ হয়েছে ?'

'হবে, যদি বলো ববি মুয়েলার সম্পর্কে কি জানো তুমি।'

নিরেট তথ্য দেয়ার অনুরোধ পেয়ে বিস্মিত ও শান্ত হলো মরিস। 'মুয়েলার,' বললো সে। 'শুধু নাম শুনে চিনবো বলে মনে হয় না।'

কথা বলার ফাঁকে ব্যাগটার কমবিনেশন লক খুলে ফেলেছে রানা, ভেতরের একটা পাউচ থেকে ববি মুয়েলারের একটা ফটো বের করলো ও। মরিসের হাতে ধরিয়ে দিলো সেটা। 'টাকা, লেনদেন, এ-সব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলো লোকটা,' বললো ও। 'অস্ত্র চোরাচালানের সাথেও জড়িত ছিলো। আমার সন্দেহ, ড্রাগ ব্যবসাও বাদ দেয়নি। ঠিক জানা নেই।'

ফটোটার দিকে খুব একটা মন দিয়ে তাকালো না মরিস। খানিক পর নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছাড়লো। 'আমার যদি ভুল না হয়, ফটোটায় যে মুয়েলারকে আমি দেখছি, তার তলপেটে আর বুকে তিনটে বুলেট ঢুকেছিল। আমি বলবো, নিদেনপক্ষে নাইন মিলিমিটার।'

রানা কিছু বললো না।

'আপনি তাকে খুন করেছেন?'

এবারও চুপ করে থাকলো রানা।

'মনে হচ্ছে আপনি তাকে খুন করেছেন।'

'আমাকে তোমার কতোটুকু জানাবার আছে, মরিস?'

'একটুও না,' বললো মরিস। 'এই লাশ আমি চিনি না। কেন আপনার মনে হলো লোকটা ড্রাগ ব্যবসা করতো?'

'সত্তর দশকে ববি মুয়েলার নিকারাগুয়েতে বাস করতো,' বললো রানা। 'আইলাজ দ্য মেইজ-এ একটা জায়গা ছিলো তার, সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ হানা দেয় সেখানে, বাড়িটায় একটা কোকেন-প্রসেসিং ল্যাব পাওয়া যায়। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু, ড্রাগের সাথে তাকে জড়ানো যায়নি।'

'তাহলে?'

'ববি মুয়েলারের ফাইলটা টমাস কালভিনকে আমি দেখাই, ওয়াশিংটনে। সে কিছু মন্তব্য করে। মুয়েলারদের পারিবারিক ডিসটিলারিটা ড্রাগ কনভারশন-এ লাগে এমন ধরনের কেমিক্যাল কেনার জন্যে ভালো একটা কাভার হতে পারে। ওরা একটা পরিবহণ সংস্থারও মালিক, সেটার সাহায্যে কলম্বিয়ার ভেতর ড্রাগ সাপ্লাই দেয়া সম্ভব। তবে সবচেয়ে যেটা বিচলিত করে কালভিনকে, তা হলো, ববির বাবার বিয়েটা। রলফ মুয়েলার বিয়ে করেন ডেল নামে এক মেয়েকে। তার একটা বোন আছে। সেই বোন বিয়ে করে সাঁতেলা লজেন নামে আরেক লোককে। ওদের ভিক্টর নামে এক ছেলে আছে। তাকে তুমি চেনো?'

সাপের ঘরে ঢোকার পর এই প্রথম বুশমাস্টারের ওপর আগ্রহ

হারিয়ে ফেললো মরিস। 'আপনি তো সাহেব আশ্চর্য মানুষ। যখন কোনো নাম উচ্চারণ করেন, চুনোপুঁটিরা বাদ যায়। সব রুই-কাতলা। ভিক্টর লজেন আরো বড়—বোয়াল।'

'এমন কিছু বলো যা আমি জানি না।'

'এটা দেখুন,' চেহারায় আক্রমণাত্মক ভাব নিয়ে মরিস বললো। 'মাস পনেরো আগে কিছু তরুণ ফুলবাবু, ড্রাগ ব্যবসার সাথেই জড়িত, ভিক্টর লজেনের বুড়ো বাপ সাঁতেলাকে কিডন্যাপ করে। ওরা তাকে আটকে রাখে বিশ লক্ষ ডলার মুক্তিপণ পাবার আশায়। কিন্তু ভিক্টর তল্লাশী চালাবার জন্যে তার সৈনিকদের মাঠে নামাচ্ছে দেখে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তারা। আমাদের হিসেবে, অল্প কয়েক ঘণ্টার নোটিসে এলাকার রাস্তাগুলোয় তিন হাজারের মতো সশস্ত্র লোক নেমে আসে। সঠিক কেউ জানে না। সংখ্যাটা পাঁচ হাজারও হতে পারে। ভিক্টর এক ঝাঁক হেলিকপ্টারও পাঠিয়েছিল। আর পাহাড়ে বড় একটা দল নিয়ে ক্যাম্প ফেলে সে নিজে, যে-কোনো আধুনিক সেনাবাহিনীর মতো রণ-প্রস্তুতি নিতে দেখা গেছে তাদের।'

'সে কি তার বাবাকে ফেরত পেয়েছিল?'

'পায়নি মানে!' চোখ বড় বড় করলো মরিস। 'বুড়োর গায়ে আঁচড়-টিও লাগেনি। এতো সব আয়োজন কার জন্যে শুনবেন? সম্পূর্ণ বাতিল এক লোকের জন্যে। প্রায় দশ বছর আগে স্ট্রোক হয়েছিল সাঁতেলা লজেনের। সেই থেকে বিছানায় কাত হয়ে আছে। সম্ভবত তরল খাবার খায়—মুখ দিয়ে খায়, নাকি নাকে ঢেলে দিতে হয় জানি না। তবে, ভিক্টর ভারি আবেগপ্রবণ। ব্যবসার কলা-কৌশল বাপই তো তাকে শিখিয়েছে—যেমন, চোখে দেখা যায় না এমন বুলেট দিয়ে কিভাবে মানুষকে খুন করতে হয়। কি নাম বুলেটটার? সন্ত্রাস, ওরফে

আতংক। সিলেকটিভ মার্ডার।'

'বাপকে ফিরে পেলো, তারপর?' জানতে চাইলো রানা। 'ভিক্টর লজেন প্রতিশোধ নেয়নি?'

'নিজের পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা বের করলো ভিক্টর লজেন,' বললো মরিস। 'তাতে কিছু লোকের তালিকা ছাপা হলো, লোকগুলো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলম্বিয়া ছেড়ে চলে যাবে। হয় চলে যাবে, নয়তো মারা পড়বে। সে এমনকি তার নিজের রেডিও স্টেশন থেকেও ঘোষণাটা প্রচার করে।'

'লোকগুলো কি করলো? নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিলো?'

'একজনও না। বেশিরভাগ কলম্বিয়া ছেড়ে পালালো। বাকি লোক-গুলো এখন কোথায় আপনি আন্দাজ করে নিন।'

'হুম।'

চেহারায় নগ্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে রানার দিকে তাকালো মরিস। 'তার ক'টা বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট আছে শুনবেন? জানতে চান, কতো একর জমির মালিক সে? আপনি তার এয়ারলাইন্সের প্লেনে চড়ে বেড়াতে চান? যোগ দিতে চান তার রাজনৈতিক দলে? তার ফুটবল ক্লাবের সদস্য হবেন? কি চান আপনি?'

'আমি তার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো জানতে চাই,' বললো রানা। 'মানুষটা সম্পর্কে।'

অনুরোধটা যেন পছন্দ হলো মরিসের। আজ এই প্রথম নির্ভেজাল হাসলো সে, সম্ভবত চলতি হপ্তায় এই একবারই। 'ভালো কথা বলে-ছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ভিক্টরের ব্যক্তিত্ব আছে। কার্টেল-এর অন্য সব মহারথীরা—এসকোবার, হোসে গাচা, ওকোয়াস—স্রেফ মাফিয়া গড ফাদারদের সাথে বদলে নেয়া যায়। ভালো পরিবার থেকে

এসেছে সবাই। স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা আছে। মর্যাদা রক্ষা করে চলাফেরা করে। নিজেদের তৈরি ড্রাগ ছুঁয়েও দেখে না। ব্যবসার স্বার্থে না হলে খুনখারাবির মধ্যে নেই।

'কিন্তু ভিক্টর লজেন অন্য জিনিস। তাকে রক-অ্যাণ্ড-রোলার বলা হয়। কড়া ডোজ চাই তার, মাঝে মধ্যে মাসের পর মাস নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। মেয়েমানুষ তার বিশেষ প্রিয়, একসাথে পাঁচ-সাতটা না হলে মন ভরে না। শোনা যায় পুরুষমানুষেও নাকি তার অরুচি নেই। হয়তো গুজব, কিন্তু সূত্রটা নির্ভরযোগ্য, সে নাকি সাপের সাথেও সহবাস করে। স্রেফ হাস্যকৌতুকের জন্যে অনেক কাজ করে সে, তার মধ্যে একটা হলো পোষা জাগুয়ারকে জ্যান্ত ঘোড়া খেতে দেয়া। মার্কিন-বিরোধী একজন ফ্যাসিস্ট হিসেবে সিনেট নির্বাচনে দাঁড়াতে চায় সে, কিন্তু পারছে না রোনাল্ড রিগ্যানের সাথে বনিবনা হচ্ছে না বলে।' বিরতি নিলো মরিস, তারপর বললো, 'ও, হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার।'

'কি ব্যাপার?'

'দুধসাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে সে।'

চার

মরিসকে চিড়িয়াখানায় রেখে গাড়িতে ফিরে এলো রানা। পিনেলকে বললো, 'শহরের মাঝখানে নয়, ট্যুরিস্টরা যেদিকে যেতে চায় না, এমন কোথাও একটা রেস্তোরাঁয় বসতে চাই।' যাবার পথে ব্যাগের জিনিসগুলো পরীক্ষা করলো ও। দু'প্রস্থ নাইলন রশি, মিনিয়েচার ট্র্যান্সমিটার, ছুরি অ্যামপুল ও সিরিঞ্জ, নাইট স্কোপ, তালা খোলার সরঞ্জামসহ আরো দু'চারটে দরকারী জিনিস।

ব্যাগে একটা এস. আই. জি. ২১০ সিঙ্গেল অ্যাকশন পিস্তলও রয়েছে। মরিসের অনুমান নির্ভুল দেখে অস্বস্তিবোধ করেছে রানা। তবে ববি মুয়েলার যে পিস্তলের গুলিতে খুন হয়েছে, সিগটাকে সেই একই অস্ত্র বলা যাবে না। ওটার রাইফ্লিং কাউন্টার ক্লক-ওয়াইজ করে নিয়েছে রানা, তাতে সিঙ্গেল-শটের বেলায় লক্ষ্যভেদে কোনো অসু-বিধে হবে না, লাভ হবে র্যাপিড ফায়ারের সময়—কাঁধের ওপর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে না চেয়ে অস্ত্রটা ওর শরীরে ধাক্কা দেবে। সামান্য এইটুকু পার্থক্য জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে সীমারেখা টেনে দিতে পারে। মরিসের কথাবার্তা থেকে ঝোঝা গেছে, এই পরিবর্তনের উপ-

কারিতা পরখ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

পিনেলের পছন্দ করা রেস্তোরাঁটা এমন এক এলাকায় যে নারকোটিকজনিত সমৃদ্ধির ছোঁয়া পায়নি এখনো। দোতলার চেয়ে উঁচু কোনো বাড়ি নেই, একটা ছাদেও নেই টালি। রাস্তার ধারেই বাজার বসেছে, এমনকি খোলা ফুটপাতে ভেড়ার আস্ত বাচ্চা গনগনে আগুনে ঝলসানো হচ্ছে। প্রায় সবগুলো পাঁচিলের মাথায় একটা করে লাউডস্পীকার। কান ফাটানো আওয়াজে গান শুনতে ভালোবাসে মেডিলিনের লোকজন।

খাওয়া শেষ করে একটা কিউবান চুরুট ধরালো রানা, এই সময় কাজ সেরে ফিরে এলো পিনেল।

'এই কাগজটাই তো চেয়েছিলেন, সিনর?'

দৈনিক পত্রিকাটা হাতে নিলো রানা, দেখলো ভিক্টর লজেনের লা জোডিয়াকা-ই বটে। সিগারে টান দেয়ার ফাঁকে হেডিংগুলোর ওপর চোখ বোলালো ও। খবর আর সম্পাদকীয়তে মার্কিন বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট, খেলা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্যে ছাড়া হয়েছে বিরাট জায়গা। প্রতিটি লেখাতেই ফ্যাসিস্ট আদর্শের আভাস পাওয়া যায়। লোগো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সাদা একটা ভেড়া।

রানার কৌতূহল সম্পর্কে নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পিনেল। বিল মিটিয়ে আরোহীকে নিয়ে গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আধমরা হয়ে গেল সে। তারপর শুরু হলো তার বকবকানি। 'আপনি কি, সিনর, হোয়াইট গামা সম্পর্কে আগ্রহী?'

'কি সম্পর্কে?'

'ভিক্টর লজেনের পার্টি সম্পর্কে,' বললো মরিস। 'পার্টির পত্রিকার নাম জোডিয়াক, লোগো মেষ, আর মেষের প্রতীক হলো গামা।

গোটা ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়।'

'সাধারণ একটা ব্যাপার রহস্যময় করে তোলা হয় সাধারণত কিছু লুকোবার জন্যে, পিনেল।'

'আপনি কলম্বিয়ায় রয়েছেন, সিনর। এখানে যা কিছু সাধারণ সব গোপন করা হয়। আর সমস্ত গোপন জিনিস সরাসরি লোকের চোখের সামনে রাখা হয়।'

রানা ভাবলো, পিনেলের চিন্তা-ভাবনা ঠিক যেন একজন স্পাইয়ের মতো। 'এ-সব বিশ্বাস না করাই ভালো, পিনেল,' বললো ও। 'পাগল হয়ে যাবে।'

বিড়বিড় করে স্প্যানিশ ভাষায় যা বললো পিনেল, তার মানে দাঁড়ায়, কলম্বিয়ায় পাগলামিও একটা সাধারণ রোগ। তারপর সে তার নিজের আয়-রোজগার সম্পর্কে সচেতন হলো। 'আপনি সম্ভবত কালও শহর দেখতে বেরোবেন, সিনর। আসল কলম্বিয়াকে দেখতে চাইলে অবশ্যই শহর থেকে দূরে যেতে হবে আপনাকে। আমি আপনাকে পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারি। সান্তা ফে চিড়িয়াখানা আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে, আমি হলপ করে বলতে পারি, কোপাকাবানার চিড়িয়াখানাটা আপনার আরো ভালো লাগবে। ওটা হাসিয়ানদা ভিসি-তে, ভিক্টর লজেনের মালিকানাধীন একটা থিম পার্ক।'

'থিম পার্ক?' বললো রানা।

'কলম্বিয়াবাসীদের জন্যে তার একটা উপহার,' এক গাল হাসি নিয়ে বললো পিনেল। 'তবে, ঢুকতে চাইলে টিকেট কাটতে হয়।'

অপরাধীদের নিয়ে সবাইকে হাসি ঠাট্টা করতে দেখে রেগে আছে রানা, এবার সেটা প্রকাশ পেলো। 'সবজান্তার ভান বাদ দিয়ে, এ-ব্যাপারে তোমরা কিছু করো না কেন?'

'এ-ব্যাপারে, সিনর ?'

'ড্রাগ ব্যবসার বিরুদ্ধে।'

'আমি, সিনর ?'

'হ্যাঁ, তুমি,' বললো রানা। 'কুকুরগুলোর বিরুদ্ধে যারা লড়তে চায় তাদেরকে ভোট দিতে পারো।'

মাথা নেড়ে রিয়ার ভিউ মিররে তাকালো পিনেল। 'একটা কথা নিঃসংশয়ে জানি আমি, সিনর। পলিটিক্স আর ড্রাগস—হুটোর মধ্যে কম বিপজ্জনক হলো ড্রাগস। ককেরসরা খুন করে শুধু লাভের জন্যে। কেউ যদি ইনফরমার হয় তাহলে ককেরসরা তাকে, বড়জোর তার পরিবারকে খুন করবে। কিন্তু পলিটিক্স লা ভায়োলেনশিয়া খুন করবে হাজার হাজার মানুষকে।'

লা ভায়োলেনশিয়া। ভায়োলেন্স। হিংস্রতা। শুরু হয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশে বোগোটার লিবারেল মেয়রকে খুন করার মধ্যে দিয়ে, পরবর্তী প্রায় পনেরো বছর ধরে তার রেশ চলতে থাকে। লা ভায়োলেনশিয়া অঘোষিত গৃহযুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়।

'তবু আরেকবার ঝুঁকি নেয়ার এটাই সময়, পিনেল। এই ড্রাগ শুধু কলম্বিয়া বা তোমাদের নয়, গোটা হুনিয়ার সর্বনাশ ডেকে আনছে।'

'আপনার পক্ষে বলা সহজ, কারণ আমার জায়গায় আপনি বসবাস করেন না। কাল ডাস-এর কাছাকাছি একটা গ্রাম থেকে এসেছি আমি। উপত্যকার একদিকে একটা শহর আছে, শহরটার সব কিছু নীল রঙের, রক্ষণশীলদের আস্তানা। উপত্যকার অপর দিকটা লাল শহর, লিবারেলদের ঘাঁটি। নীল শহরে আপনি যদি একটা লাল টাই পরেন, সিনর, আপনাকে ওরা কোনো প্রশ্ন না করে গুলি করবে। গাঁজাখুরী গপ্পো নয়, সিনর।'

'তোমাদের ওদিকে সরকার নেই ?'

'বড় শহরগুলোর বাইরে সরকারের কোনো অস্তিত্ব আপনি খুঁজে পাবেন না। আপনি যদি লাল হন, আপনার প্রথম ও প্রধান কাজ নীলদের মেরে নির্বংশ করা। মাঝে মধ্যে ঘটেও তাই। একটা পাড়ায় গিয়ে সবাইকে খুন করে আসে। গরু-ছাগলও মারছে ওরা, কারণ ওগুলোর গলায় নীল বা লাল ফিতে থাকে। কলম্বিয়ার মানুষ শুধু অস্ত্রের ভক্ত নয়, তারা খুন করতে ভালোও বাসে। ড্রাগ ব্যবসায় কিন্তু এটা দেখা যায় না। কোকেন সম্রাটরা লাভ না দেখলে রক্ত ঝরাতে রাজি নয়।'

আলোচনাটা লম্বা করতে মন চাইলো না রানার। হোটেলে ফেরার পথে আর কোনো কথা হলো না। আগের সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা আবার ফিরে এলো শরীরে, যেন একটা মায়া বা স্বপ্নজগতের ভেতর রয়েছে ও। শহরে রাত নেমেছে রক্তবর্ণ আর নীল গাঢ় ছায়া নিয়ে, উঁচু ভবনগুলোর আলো কোথাও জ্যামিতিক কোথাও নিরাকার নকশা তৈরি করেছে, চওড়া এভিনিউগুলোকে বেড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাম গাছগুলোকে দৈত্যাকৃতি অশুভ ফুলের মতো লাগলো। শহরে কোথাও বিশৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র নেই, সব কিছু সাজানো-গোছানো ও রুচিসম্মত। উদ্বেগ আর অস্বস্তি শুধু ওর মনে। শহরটাকে দেখে বিশ্বাস করা কঠিন শোনা কথাগুলো সত্যি হতে পারে।

ক্যারেরা ফিফটি-ওয়ানে ঢুকলো গাড়ি। পিনেলের সাথে কথা বলে হোটেল খানিকটা দূরে থাকতেই নেমে পড়লো রানা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোথাও দেখতে পেলো না হোণ্ডাটাকে। হোটেল বিল্ডিঙের আশপাশেও এমন কাউকে দেখা গেল না যাকে সন্দেহ করা যায়। এর মানে হতে পারে রানা হোটেলে নেই জানতে পেরে লোকগুলোও

চলে গেছে। উল্টোটাও হতে পারে, রানা ফাঁকি দেয়ায় তাদের কৌতূহল বেড়ে গেছে আরো, অপেক্ষা করছে হোটেলের ভেতর, সম্ভবত ওর স্যুইটে।

লবিতে তাদের দেখা গেল না। অল্প কিছু লোক রয়েছে, পরিবেশটা শান্ত। ব্যাগটা হোটেলের সেফে রাখলো রানা, শুধু পিস্তল আর ছুরিটা পকেটে রয়েছে। এলিভেটরে চড়ে ছ'তলায় উঠে এলো, তারপর সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় নামলো। হলে পৌছে চারদিকে তাকালো, ধীর পায়ে এগোলো, ছাড়িয়ে এলো নিজের স্যুইট-সামনে আরেকটা সিঁড়ি দেখতে পেলো। চারশো ষোলো নম্বরে কেউ আছে বলে মনে হলো না। ফিরে এসে দরজাটা পরীক্ষা করলো ও। কবাট আর চৌকাঠের মাঝখানে সরু কাগজের টুকরোটা জায়গামতোই পেলো। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

দরজার কবাট পুরোপুরি খোলা রেখে নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা, কারণ দরজা ছাড়াও একটা হোটেল-স্যুইটে ঢোকার আরো অনেক উপায় আছে। দ্রুত ভেতরে ঢুকে ডান দিকে সরে গেল ও। ওখান থেকে সিটিংরুমের সবটুকু আর বাথরুমের দরজা পুরোপুরি দেখতে পাবে। পরবর্তী পাঁচ মিনিট অন্ধকারে নিঃশ্বাসের শব্দ চেপে রাখা ছাড়া আর কিছু করলো না রানা। অন্য কোনো উৎস থেকে অসহিষ্ণুতার আভাস পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিছুই পেলো না দেখে শম্বুকগতিতে কামরাটা ঘুরে এলো একবার। বন্ধ করলো দরজা। দু'মিনিট পর, কিছু না পেয়ে, আলো জ্বাললো।

খুঁতটা সাথে সাথে চোখে পড়লো। স্যুইট ত্যাগ করার আগে বড়সড় একটা তারকাচিহ্ন তৈরি করেছিল রানা। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল টেলিফোন, অ্যাশট্রে, নাইটস্ট্যাণ্ডে রাখা ল্যাম্প,

কফি টেবিলের কোণ, আর দরজার পিছনে সাঁটা হোটেল কর্তৃপক্ষের নোটিস। বিছানার পায়ের দিকে দাঁড়ালে রানার থাকার কথা তারকা-চিহ্নের ঠিক মাঝখানে। কিন্তু নিজেকে একপাশে দেখতে পাচ্ছে ও।

কেউ একজন স্যুইটে ঢুকেছিল। রুমসার্ভিসকে বারণ করে গেছে ও, কেউ যেন না ঢোকে। সিটিংরুমটা নিখুঁতভাবে সাজানো দেখে গেছে ও, টেবিলের ওপর ঝুড়িভর্তি ফল সহ। ফলগুলো তখনই ওর দৃষ্টি কেড়েছিল, কোনো কোনোটা আগে কখনো খায়নি বা দেখেনি। তবে সংখ্যায় ক'টা ছিলো বলতে পারবে না, আর সাদা রঙের কোনো ফলও ছিলো না।

কিন্তু ঝুড়িতে এখন সাদা একটা ফল রয়েছে। অন্তত একটা।

উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট থাকলে রানা হয়তো অন্য কোনো উপায় বেছে নিতো। তার বদলে যা করলো, ওটাই একমাত্র বিকল্প। কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে ও।

জলদি! জলদি!

সিদ্ধান্তটা ঠিকই ছিলো, কিন্তু সামান্য দেরিতে নেয়া হয়েছে। দরজার দিকে লাফ দিলো রানা, হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো কবাট, করিডরে বেরিয়ে এসে নিজের পিছনে বন্ধ করছে ওটা, এই সময় বেজে উঠলো টেলিফোনটা।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাতে যাচ্ছে রানা, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর সাথে বিস্ফোরিত হলো সিটিংরুমের ভেতরের দেয়াল-গুলো, তারপর সামনের দেয়াল আর দরজা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো ওকে, কেড়ে নিলো ওর দু'হপ্তা সময়।

পাঁচ

রোম, ২২শে জুলাই, ১৯৪৫।

পিয়াজা নোভোনা থেকে ভায়া ডেল'আনিমা-য় তিন দিক থেকে পৌছুনো যায়, কারো চোখে না পড়ে সান্তা মারিয়া ইনস্টিটিউটে যাবার জন্যে সর্ব উত্তরের পথটা বেছে নিলেন মুলার। বার্লিনের ধ্বংসস্তূপ ত্যাগ করার পর খানিকটা খুঁড়িয়ে হাঁটেন তিনি—রেড আর্মির কোনো উপহার নয়, এর জন্যে দায়ী ইটালিয়ান পাহাড়ে একটা দুর্ঘটনা। গোড়ালির ব্যথাটা ছাড়া, রোম পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষার যাত্রায় শরীরটা তাঁর ভালোই ছিলো, নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করায় প্রাণশক্তি আগের চেয়ে বরং বেড়েছে। বয়স হয়েছে, তাঁকে ঠিক যুবক বলা যাবে না, কিন্তু আগে কখনো নিজেকে এতোটা সুস্থ আর সবল মনে হয়নি। অনুভব করছেন, দ্বিতীয়, সম্পূর্ণ নতুন একটা জীবনে প্রবেশ করছেন তিনি।

কাল তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা হবে। সান্তা মারিয়া ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন জার্মেনীর আর্থিক আনুকূল্য পেয়ে এসেছে, ইনস্টিটিউটের রেক্টর, বিশপ অ্যালোইস হুডাল, অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। আইখম্যান, কানটেনব্রুনার

ও হিটলারের মতো হুডালও একজন অস্ট্রিয়ান, ওঁদের তিনজনের মতো হুডালও আদর্শ জার্মান হবার জন্যে চেষ্টার কোনো ক্রটি করেননি। হেনেরিক মুলারের জন্যে এটা একটা সুসংবাদ।

যুদ্ধের আগে থেকেই, হুডাল 'দি ফাউণ্ডেশন অভ ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম' নামে বইটা লেখার পর থেকে, দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো। শোনা যায় হিটলার নাকি বইটার ভূমিকাটুকু পড়েছেন। প্রভাবশালী সব ক'জন পার্টি সদস্য বইটার প্রশংসা করেছেন। ভালোমানুষ বিশপ শুধু নাৎসী আদর্শ প্রচার করেননি, সেই সাথে ভ্যাটিকানে তিনি মার্কসবাদ বিরোধী একটা আন্দোলনেরও সূচনা করেন—ক্যাথলিক আদর্শের জন্যে মার্কসবাদই তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় হুমকি। তাঁর কমিউনিস্ট বিরোধী প্রোগ্রাম 'আখ্যা লাভ করে 'অ্যাকশন হুডাল' নামে।

কিন্তু রোমে পৌঁছুবার পর কিভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ করবেন, দেখা করে কি বলবেন, এ-সব নিয়ে অনিশ্চিত ছিলেন মুলার। বার্লিন ভস্ম হওয়ার সাথে সাথে অনেক মানুষের ভেতরকার অন্ধ আবেগ বা উন্মাদনাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাজেই, হুডাল সাথে সাথে তাঁর চিরকুটের প্রাপ্তিস্বীকার করে জবাব দেয়ায় একাধারে বিস্মিত ও খুশি হলেন গেস্টাপো প্রধান। যুদ্ধের সময় কেলার-এর মাধ্যমে যোগাযোগ হতো, তখন একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন তিনি, তারই একটা ব্যবহার করেছেন এবারকার চিরকুটে। উত্তরে হুডাল জানিয়েছেন, মুলার—হের মুয়েলার—তাঁর সাথে নির্দ্বিধায় দেখা করতে আসতে পারেন। নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

কলেজে সময়মতোই পৌঁছুলেন মুলার, এই মুহূর্তে যিশুর একটা পেইন্টিঙের নিচে চুপচাপ বসে আছেন। পথ দেখিয়ে এই অফিস

কামরায় আনা হয়েছে তাঁকে, অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষা করছেন মুলার। ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন তিনি, বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন, এই সময় ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে কামরায় ঢুকলেন বিশপ হুডাল।

লম্বা, কুৎসিত বিশপ দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে আসার সময় হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন সামনে। 'হেনেরিক, আমার ধারণাই ছিলো না অবরোধ ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছো তুমি!'

বিশপের সাথে কিভাবে খেলতে হবে, ঠিক বুঝতে না পেরে প্রায় সত্যি কথাটাই বললেন মুলার, 'যতোক্ষণ সম্ভব হয়েছে, ছিলাম, ফাদার। সিটাডেলে আর যদি পঁয়তাল্লিশ মিনিট থাকতাম, আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না।'

'ব্যাপারটা পাগলামি ছিলো—বার্লিনের প্রতিরক্ষা,' বললেন বিশপ। 'শেষের দিকে হিটলার নিশ্চয়ই পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।'

'মরার জন্যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তিনি,' বললেন মুলার। 'রাশিয়ানদের হাতে ধরা পড়তে চাননি। আপনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝবেন।'

'বুঝি এবং প্রশংসা করি,' হুডাল বললেন। মুলারের হাত দুটো ছেড়ে দিলেন তিনি, এক পা পিছিয়ে তাঁর আপাদমস্তকে চোখ বোলালেন। 'কিন্তু তোমাকে দারুণ লাগছে, হেনেরিক। পরাজয় মনে হচ্ছে তোমার কাছে অর্থহীন। আগের চেয়ে যেন উন্নতি ঘটেছে তোমার··· চেহারার।'

'বার্লিনে আহত হই আমি,' দ্রুত বললেন মুলার, সার্জিক্যাল অপারেশনটার কথা এড়িয়ে গেলেন, যার দরুন নতুন একটা চেহারা পেয়েছেন তিনি। 'কাজেই চিকিৎসা করাতে হয়েছে।'

মুলারের দিকে পিছন ফিরলেন হুডাল, তাঁর কথা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করেননি। নিজের ডেস্কের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'পাশের কামরা থেকে লক্ষ্য করছিলাম তোমাকে। নিশ্চিত হতে চাইছিলাম সত্যি তুমি হেনেরিক কিনা। শেষবার আমরা মিলিত হয়েছিলাম তেতাল্লিশ সালের গরমে—তোমার চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিলো। পরিস্থিতিটাও ছিলো আলাদা।'

'সত্যি তাই।' তেতাল্লিশের গ্রীষ্মে ফ্যাসিজম ইউরোপ শাসন করতো, রাশিয়ায় কি ঘটতে যাচ্ছে তখনও তা পরিষ্কার বোঝা যায়নি, হিটলারের নির্দেশে মুলার তখন ইটালিয়ানদের বুদ্ধি দিচ্ছে কিভাবে ইহুদিদের সামলাতে হবে। সেই অ্যাসাইনমেন্টে বিশপ হুডাল তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। 'কিন্তু, ফাদার, আজ আমি আপনার কাছ থেকে সেই পরিমাণ দয়া পাবো বলে আশা করি না।'

'কেন নয়?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন হুডাল।

'কারণ আমি একজন ফেরারী।'

'কিন্তু তুমি একজন ক্যাথলিক।'

ইতস্তত করলেন মুলার। তাঁর পরিবার ক্যাথলিক। 'ইয়েস, ফাদার।'

'কাজেই ঈশ্বরের কাছে তুমি ফেরারী হতে পারো না। ঈশ্বরের দয়া থেকে কেউ তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।'

'কথাটা হয়তো ঠিক, ফাদার, কিন্তু ইহুদিদের ব্যাপারটার জন্যেই সন্দেহ।'

'সত্যিই কি অতোটা খারাপ ছিলো?' কৌতূহল প্রকাশ করলেন হুডাল। 'যতোটা শোনা গেছে?'

'আমি জানি না,' মুলার বললেন। 'আমার ধারণা কেউই জানে না। আইখম্যান একবার আমাকে বলেছিল, সাফল্যে আর নেশায়

বুঁদ হয়ে, আমরা নাকি শুধু ক্যাম্পেই পঞ্চাশ লাখ মানুষকে খতম করেছি। আমার ধারণা, বাড়িয়ে বলেছিল।'

'পঞ্চাশ লাখ!' সংখ্যাটা উচ্চারণ করার পর ঝুলে পড়লো বিশপের চোয়াল। 'তা কি করে সম্ভব!'

'থার্ড রাইখ কোনো কাজকেই অসম্ভব বলে গণ্য করতো না; ফাদার। বিশ্বাস করুন, ব্যাপারটা ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া যাবে না। ইহুদি-দের আরেকটা কিংবদন্তী হয়ে থাকবে।'

'ঠিক এভাবেই দাবি উঠবে, কমিউনিস্টরাও শহীদ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ফাদার।'

ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে বসলেন বিশপ হুডাল। যা শুনলেন তাতে করে তাঁর অসুস্থতা যেন আরো বেড়ে গেছে। 'এ-সব গুজবের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে কিছুই কি করার নেই?'

গুজব। মুলারের জানা নেই শব্দ চয়নে কে বেশি দক্ষ, ভ্যাটিকান নাকি এসএস। দুটোর মধ্যে অদ্ভুত এক মিল আছে, গূঢ় রহস্যে বিশ্বাসী। 'সময়ে ব্যাপারটার প্রভাব আমরা কমিয়ে আনতে পারবো,' বললেন তিনি। 'তবে এই মুহূর্তে আদর্শের অস্তিত্ব রক্ষা ছাড়া তেমন কিছু করার নেই আমাদের। আবার কাজ শুরু করার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকালেন হুডাল। তিনিও বোঝেন যে আজকের এই সাক্ষাৎ-কারের পিছনে কারণ আছে। তাঁর চার্চের উপকার হয়েছে এমন দু'-পাঁচটা কাজের কথা তিনি ভুলে যাননি। তার একটা উদাহরণ হলো, তিনি জানেন, এই মুলারই, বোরম্যানের সাহায্য নিয়ে, পোপকে কিড-ন্যাপ করার হিটলারের উদ্ভট প্ল্যানটা বাতিল করেছিলেন। আজ যদি বোরম্যানও এই অফিসে পা রাখতেন, বিশপ হুডালের কাছ থেকে

এই একই ধরনের সাহায্য পেতেন। কিন্তু মার্টিন বোরম্যান দুনিয়ার কোথাও আর পদার্পণ করবেন না। এ-ব্যাপারে মুলার পুরোপুরি নিশ্চিত।

'আপাতত, হেনেরিক, এই কলেজে তোমার আমি থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তোমার পছন্দ হবে কি ?'

'পছন্দ কি বলছেন, আমি ভীষণ খুশি হবো। আপনার এই উদারতা কোনো দিন ভুলবো না, ফাদার। কিন্তু আপনার আশ্রয়ে বেশিদিন আমার থাকা হবে না। আমাদের দু'জনের জন্যেই সেটা বিপদ ডেকে আনবে।'

'একমত।'

'আরো স্থায়ী ধরনের পবিত্র আশ্রয় দরকার হবে আমার,' বললেন মুলার। 'আমার জন্যে, জার্মেনী থেকে যারা বেরিয়ে আসবে তাদের জন্যেও।'

'কি ধরনের পবিত্র আশ্রয় ?'

'যা শুধু ভ্যাটিকানের পাসপোর্টধারীরা পেতে পারে,' বললেন মুলার। 'আইডেনটিটি সার্টিফিকেট নয়, রেগুলার ভ্যাটিকান পাস-পোর্ট।'

টেবিলের দিকে মাথা নিচু করলেন হুডাল। এই টেবিলে বসে একের পর এক অনেকগুলো বই লিখেছেন তিনি। এই চেয়ারে বসে তিনি তাঁর প্রভাব সেন্ট পিটারের সিংহাসন পর্যন্ত বিস্তার করেছেন, তাঁর ভক্তে পরিণত করেছেন সিংহাসনের বর্তমান মালিক বারোতম পাইয়াসকে। তাঁদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের পুরনো, সেই হুডাল যখন অর্ডার অভ জার্মান নাইট-এর প্রকিউরেটর জেনারেল ছিলেন, আর ইউজেনিয়ো পাসিলি ছিলেন জার্মানীতে পোপের দূত। এই ব্যক্তিগত

সম্পর্কের জন্যেই হুডাল এমন একটা ক্ষমতা পেয়ে যান, যা সামান্য একজন বিশপের পাবার কথা নয়। 'তোমাকে নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই যে অনুরোধটা রক্ষা করা সহজ নয়।'

'খরচার জন্যে টাকার ব্যবস্থা আছে,' সাথে সাথে জবাব দিলেন মুলার। 'দশ লাখ মার্কিন ডলার জমা দেবো আমি, আপনার ইচ্ছে-মতো খরচ হবে। যদি কিছু বাঁচে, অবশ্যই তা চার্চের কাজে লাগানো যাবে।'

বিশপ বললেন, 'আচ্ছা।' বুঝতে পারছেন তিনি।

'এই ফাণ্ড একটা মাত্র শর্তে পাওয়া যেতে পারে, দাতার নাম প্রকাশ পাওয়া চলবে না।'

'এতো টাকার বিনিময়ে সামান্যই চাইছো তুমি।'

মাথা ঝোঁকালেন মুলার। 'সামান্য উপকারও কখনো কখনো গুরুত্ব-পূর্ণ ও দরকারী হয়ে ওঠে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বুজলেন হুডাল। আবার যখন চোখ মেললেন, তাঁর মুখে রঙ ফিরে এসেছে। 'আমার এক তরুণ বন্ধু আছে, সেক্রে-টারিয়েটে বসে, সেকশন টু-র হেড, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা ঘামায়। এ-ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে তাকে রাজি করানো যেতে পারে।'

'পাসপোর্টের ব্যাপারে?'

'কাজটা তার দ্বারা সম্ভব,' বললেন বিশপ।

আবার মাথা ঝাঁকালেন মুলার। 'আমি আপনার প্রতিশ্রুতি পাবার অপেক্ষায় থাকবো, ফাদার।'

'তা তুমি এরইমধ্যে পেয়েছো, হেনেরিক। খুঁটিনাটি কাজগুলো শুধু বাকি আছে।' চেয়ার ছেড়ে মুলারের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন হুডাল। 'চলো, তোমাকে তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই। খুব বেশি কিছু

তোমার জন্যে করতে পারছি না, ঘরটা একজনের সাথে শেয়ার করতে হবে তোমার। আশা করি তুমি অস্বস্তিবোধ করবে না। তোমার রুমমেটও একজন ফেরারী, পলাতক—ফ্রেঞ্চ, নাকি বলা উচিত করসিকান? আমাদের একজন ভাই, ঈশ্বরহীন বলশেভিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।'

কিছু বললেন না মুলার। ঘটনার সাথে ভেসে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

ছয়

সোমা হাসপাতাল, মেডিলিন, কলম্বিয়া। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৬।

হাঁটাচলা করতে পারার পুরো দু'দিন আগে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে রানা। শেরাটনে ওর হোটেল স্যুইট বিস্ফোরিত হবার এক হপ্তা আগে ওয়াশিংটন ডি. সি.-র এক দেয়ালে ঠুকে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছিল ওর মাথা, তারপর দ্বিতীয় আঘাতটা খুলির গভীরে এমন ব্যথা সৃষ্টি করলো যে সেটা কমাবার জন্যে বিছানায় সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আত্মসম্মোহনের সাহায্য নিতে হয়েছে ওকে। ব্যথাটা কমানো গেছে, তবে একটা হাত প্রায় অকেজো হয়ে আছে।

রানা ধরেই নিয়েছিল স্থানীয় পুলিশ আর ডি. এ. এস.-এর লোক-জন বিরক্ত করবে। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে কেউ তারা এলো না। তারপর, তিন দিনের দিন, ব্যথাটা যখন সহনীয় হয়ে এসেছে, চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো হাসিখুশি এক বন্ধুর মুখ। বন্ধু মানে, টমাস কালভিন, এলো ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির ওয়াশিংটন অফিস থেকে।

নীল চোখ, বিশাল শরীর, অত্যন্ত সাহসী এবং নিষ্ঠুর, এই হলো টমাস কালভিন। জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন-এ একসাথে কাজ করেছে ওরা।

'ওরা ভাবছে তোমার ব্রেন ড্যামেজ হয়ে থাকতে পারে,' ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে বললো সে। 'আমি ওদেরকে বলেছি, ড্যামেজ হলেও কোনো ক্ষতি নেই, তুমি একটা কমপিউটার বসিয়ে নেবে ওখানে।'

'সুবিধেই হয়েছে, কেউ আমাকে বিরক্ত করেনি,' বললো রানা।

'মানে পুলিশ?'

'এবং অন্যান্যরা।'

'রানা, কি যেন একটা বলতে চাইছো তুমি, সম্ভবত স্রেফ আবর্জনা। এখন সন্দেহ হচ্ছে, কলম্বিয়ান ডাক্তাররা বোধহয় ঠিকই সন্দেহ করেছে।'

'জ্যাক মরিস,' বললো রানা। 'অন্তত লোকটা যে অযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নোংরাও হতে পারে।'

ভুরু কোঁচকালো কালভিন, কেবিনের চেয়ার দুটোর দিকে তাকালো, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে পড়লো বিছানার কিনারায়। বিছানার তোশক ডেবে যাওয়ার সাথে তিন-চার জায়গায় তীব্র ব্যথা অনুভব করলো রানা। মাথায়, ভাঙা বাঁ কব্জি আর দুটো আঙুলে।

'কেন তুমি মরিস সম্পর্কে এ-ধরনের একটা কথা বললে?' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইলো কালভিন। চেহারায় উদ্বেগ।

'এয়ারপোর্ট থেকে দু'জন লোক ফলো করে আমাকে,' বললো রানা। 'আমি মেডিলিনে আসছি, অল্প দু'একজন জানে ব্যাপারটা, তাদের মধ্যে তুমি একজন—কিন্তু যে আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে গেছে সে ছাড়া আর কেউ জানতো না কখন আমার আসার কথা।'

'সে-ও জানতো না, রানা।'

'কাঁটায় কাঁটায় নয়, কাছাকাছি সময়টা জানতো।'

'অথচ মেডিলিনে তোমার শত্রু থাকার কথা নয়?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন।

মাথা নাড়লো রানা। 'সম্ভব নয়।'

'সি. আই. এ. হয়তো তোমাকে স্থায়ীভাবে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে চাইতে পারে। কিন্তু তারাও জানে না?'

মাথা নাড়লো রানা আবার।

'আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে তোমার বন্ধু আছে।'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'এখানে আসার আগে হুবার্ট লজের সাথে দেখা করেছি আমি। তোমার তৎপরতা সম্পর্কে তিনি আমাকে ব্রিফ করেছেন।'

'আর কি বললেন তিনি?'

'তেমন কিছু না,' বললো কালভিন। 'তোমাকে জানাতে বলেছেন, লিলি ভালো আছে। তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি। এলাকার সিকিউরিটি জোরদার করা হয়েছে।'

কিন্তু রানা জানে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশনালদের কাছে সিকিউরিটি কোনো বাধাই নয়। 'ব্যস, আর কিছু বলেননি?'

'তোমাকে জানাতে বললেন, তেহরান থেকে আভাস পেয়েছেন তিনি। গোটা ব্যাপারটা শিগগিরই ফাঁস হতে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে। খুব বেশি হলে একমাস। তুমি জানো, তাঁর এ-সব কথার কি অর্থ?'

জানে রানা। ইরানে যা ঘটতে যাচ্ছে তার সাথে ওর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তবু গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে ঘটনাটার সাথে ওকে বরাদ্দ করা সময়ের প্রশ্ন জড়িত। ঘটনাটা ঘটার পর, এন. এস. এ. বা ডি. ই. এ. ওকে আর লিলিকে যে সামান্য প্রোটেকশন ও সাহায্য দিতে পারছে তা আর দিতে পারবে না। তার আগে পর্যন্ত সি. আই. এ. ওকে ছোঁয়ার সাহস দেখাবে বলে মনে হয় না। 'তোমার লোকটার সাথে এক ঘণ্টা বসতে চাই আমি, কালভিন,' বললো রানা। 'কি ঘটেছে জানতে হবে আমাকে।'

'হাসপাতালের বিছানা থেকে কাজটা করতে চাও?'

'কাল আমি চলাফেরা করতে পারবো,' বললো রানা। 'শুয়োরটার অপারেটিং প্রোগ্রাম না জানা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। তার আমি হাড়গোড় সব ভেঙে দেবো।'

মাথা নাড়লো কালভিন। 'আমাদের একজন লোককে মারার জন্যে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না, রানা। তবে, ডি. ই. এ. কলম্বিয়ার লোক মরিস। আমার অধীন নয়। আমি এখানে এসেছি নেহায়েতই কাজ সেরে ফিরে যাবার জন্যে।'

ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে লাগলো রানার। টমাস কালভিন ডি. ই. এ.-র রিজিওনাল ডিরেক্টর, স্রেফ রানার কুশলাদি জানার জন্যে কলম্বিয়ায় এসেছে, এ বিশ্বাস্য নয়। 'কেন এসেছো বললে না তো?'

রানা সরাসরি প্রশ্ন করায় খুশি হলো কালভিন। রানাকে আরেক দফা ব্যথায় নীল করে দিয়ে বিছানা ছাড়লো সে, ছোট্ট মেঝেতে পায়চারি শুরু করলো, শেষবার জানালার কাছে পৌঁছে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো, কি যেন মনে পড়ে গেছে। 'কার্টেল সবচেয়ে যেটা ভয় করে, কি সেটা, তুমি জানো?'

'বিচারের জন্যে ধরে আমেরিকায় পাঠানো হবে। এক্সট্রাডিশন।'

সঠিক উত্তর পেয়ে খানিকটা হতাশ হলো কালভিন, যদিও পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে দেরি করলো না। 'গত নভেম্বরে দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীদের একটা গ্রুপ কলম্বিয়ার সুপ্রীম কোর্টকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে তারা। সামনের গেট দিয়ে বুক ফুলিয়ে ভেতরে ঢুকলো, চব্বিশ ঘন্টার বেশি জিম্মি করে রাখলো বিচারকদের, তাঁদের দশজনকে সহ খুন করলো প্রধান বিচারপতিকে। সব মিলিয়ে একশোজনেরও বেশি লোক মারা যায়। গ্রুপটার নাম এম-নাইনটিন। কেউ কিন্তু বুঝতে পারলো না এ-ধরনের একটা হত্যাযজ্ঞ কেন তারা ঘটালো। পাবলিসিটি চেয়েছিল তারা? কিন্তু এমনিতেই তো যথেষ্ট প্রচার পায় গ্রুপটা। মুক্তিপণ? কিন্তু ওদের তো টাকার কোনো অভাব নেই। আক্রমণটা ছিলো সুইসাইডাল, এমনকি কোনো বৈপ্লবিক গ্রুপের জন্যেও। কারণটা পরিষ্কার হলো আরো পরে, আগুন থেকে ছাই সরাবার আগে নয়। ইনভেস্টিগেটররা দেখলো, বেশ কিছু এক্সট্রাডিশন ফাইল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উপসংহার: ফাইলগুলো ধ্বংস করার জন্যে এম-নাইনটিনকে বিপুল টাকা দেয় কার্টেল। নিহত বিচারকরা ওদের জন্যে বোনাস হিসেবে বিবেচিত হলেন, তাঁরা এক্সট্রাডিশন চুক্তির পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। আইনসম্মতভাবে বিদেশে পাঠানোটাকে কার্টেল কি রকম ভয় পায়, বুঝতে পারছো তো?'

'সে-কথা মরিস আমাকে বলেছে। এর সাথে ডি. ই. এ.-র সম্পর্ক কি? তুমি তো শুধু শুধু বকবক করছো।'

'তুমি যখন একটা বিদেশী রাষ্ট্রে থাকো, কথা বলা ছাড়া আর কি করার থাকে তোমার? আমরা ওদেরকে বলেছি, কোকেন সম্রাটদের খেদিয়ে দেশ থেকে বের করে দাও, বা এমন কোথাও ঠেলে দাও যেখান থেকে ধরে তাদেরকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে পারি। তারপর, তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ সহ অভিযোগ থাকে, বিচার করা হবে। সেই কাজেই এখানে এসেছি আমি। সীল করা চারটে অভিযোগ রয়েছে টামপা, ফ্লোরিডায়, ভিক্টর লজেনের বিরুদ্ধে।'

সময়োচিত খবরটায় তথ্যও আছে, উপলব্ধি করলো রানা, তবে এ-ও বুঝলো যে গল্পের এটা মাত্র অর্ধাংশ। 'কলম্বিয়া সরকার কি তাকে তুলে নিতে দিতে রাজি হয়েছে?'

'এখনো হয়নি,' কালভিন বললো। 'কারণ এক্সট্রাডিশন রিকোয়েস্ট সুপ্রীম কোর্টের সব ক'জন অর্থাৎ চব্বিশ জনের দ্বারাই অনুমোদিত হতে হবে। হামলাটা হবার পর বিচারকদের পদ খালি হয়ে গেছে না! পুরণ করা হচ্ছে।'

'তাহলে তো কথা বলার বেশি কিছু নেই আমাদের, তাই না?'

আবার পায়চারি শুরু করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো কালভিন। 'তোমার সত্যি কিছু হয়েছে নাকি, রানা? লোকগুলো তোমার সাথে সি-ফোর ভূমিকা পালন করেছে, তারপরও তুমি খেপছো না কেন?'

'ওটা কি সি-ফোর ছিলো?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো কালভিন।

'একাধিক চার্জ হওয়ার কথা।'

'আমাদের ধারণা, তিনটে ছিলো।'

তিনটের একটা ফলের ঝুড়িতে দেখেছে রানা। ওর কোনো সন্দেহ নেই, আরো ছিলো। 'আর কি জানো তুমি ?'

'ছাদ থেকে ঝুল-বারান্দা হয়ে ভেতরে ঢোকে ওরা।'

'স্যুইটটায় কোনো ঝুল-বারান্দা ছিলো না, টমাস। আমাকে তুমি অ্যামেচার ভাবছো নাকি ?'

'তোমার পাশের স্যুইটের ঝুল-বারান্দায় নেমেছিল ওরা। দুটো স্যুইটের দুই জানালার মধ্যে বারো ফুট ব্যবধান, পাথুরে দেয়ালে আমরা সাকশন মার্ক পেয়েছি।'

'তারমানে সস্তা ভাড়াটে খুনি নয়।'

'না। প্রফেশনাল।'

কাজটা করার মতো লোক সারা দুনিয়ায় একশোর বেশি নেই, ভালোভাবে করতে পারবে আরো কম লোক। তবে এক্সপ্লোসিভগুলো যে বা যারা রোপণ করেছে তাদের পরিচয় জানতে পারলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা হয়তো ঠিক নয়। তারা তো ভাড়া করা প্রফেশনাল। হেনেরিক মুলার বা ভিক্টর লজেনের মতো লোক টার্গেট আর নিজেদের মাঝখানে অনেকগুলো ধাপ তৈরি করে রাখে। নিজেদের রক্ষার জন্যে সুইচ অফ করে দেয়ার যন্ত্র ব্যবহার করে তারা, যে-কোনো আদর্শ ইন্টেলিজেন্সের মতোই। রানাকে যেটা বিরক্ত করছে, কলম্বিয়ার ড্রাগ-ব্যবসায়ীরা প্রতিটি স্তরে ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারে দক্ষ। যথেষ্ট টাকা থাকলে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা কেনা যায়, এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ব্যাপারটা।

কিংবা হয়তো অন্য আরেকটা ব্যাখ্যা আছে। মার্টিন বেকারের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুসারে, বার্লিন থেকে পালিয়ে ভ্যাটিকানে চলে আসেন হেনেরিক মুলার, সেখানে অন্যান্য নাৎসী পলাতকদের

মতো তাঁকেও সাহায্য করেন প্রো-ফ্যাসিস্ট একজন বিশপ। কর্সিকা দ্বীপে আত্মগোপন করে ছিলেন মুলার, তারপর একটা জাহাজে চড়ে আর্জেন্টিনায় চলে আসেন। ওখানে তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ পায় এফ. বি. আই., নিশ্চিতভাবে জানতে পারে বুয়েনস আয়ার্সে তিনি আসেন বিরাট অঙ্কের টাকা নিয়ে। তার কিছুদিন পরই অদৃশ্য হয়ে যান তিনি।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সাঁতেলা লজেন নামে আরেক লোক, ওই একই সময়ে একই পথ পাড়ি দেয়। মার্সেইলেস আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লিডার, একজন কর্সিকান, যুদ্ধের শেষ দিকে পালিয়ে এলো আর্জেন্টিনায়, ওখানে একটা দোকান খুলে বসে মার্সেইলেস থেকে আমদানী করা হেরোইন ছড়িয়ে দিলো দক্ষিণ আমেরিকায়। পরে, ইতিমধ্যে ডেল পরিবারে বিয়ে করেছে সে, চলে এলো কলম্বিয়ায়, নিজেদের কালচার আর নগদ টাকা ধরে রেখে বনে গেল একজন ডন।

ওই একই সময়ে হেনেরিক মুলারও উপস্থিত হলেন কলম্বিয়ায়। তিনিও ডেল পরিবারে বিয়ে করলেন, এবং টাকার জোরে নিজের ব্যবসা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন। তবে সাঁতেলা লজেন যখন ড্রাগ ব্যবসাতে কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন, মার্সেইলেস আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লোক-জন তাঁকে পুজো করতে শুরু করেছে, হেনেরিক মুলার তখন নীরব অবসর জীবন বেছে নিলেন। নিজের জমিতে চাষবাস করেন তিনি ডিসটিলারি কারখানা চালু করেছেন, তারপর একটা পরিবহন কোম্পানীও কিনলেন। মানুষটা যেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন।

'তুমি জানো, টমাস, দি কোয়ার্টারলি-র আর্টিকেলটা আমি পড়েছি—ওরা ওটাকে দি ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন বলে।'

'আমরা বলি, ফার্ম টু আর্ম। উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিশোধিত

হবার পর বাজারজাতকরণ পর্যন্ত ব্যবসার প্রতিটি স্তর কোম্পানী নিজেই সব নিয়ন্ত্রণ করবে। মধ্যসত্ত্বভোগী কেউ নেই। লাভের টাকা থেকে ভাগ পাবে না কেউ। পদ্ধতিটা কাজ করে, সেজন্যেই ওটাকে বলা হয় কার্টেল।'

'আর সেজন্যেই তোমরা চক্রান্তের অভিযোগ তুলতে পারো।'

'কারেক্ট।'

'কিন্তু ভিক্টর লজেনের বিরুদ্ধে নয়।'

'না,' বললো কালভিন। 'বাহামায় তার একটা দ্বীপ আছে। সেখান থেকে সাত টন—সা-আ-ত টন—কোকেন চালান দেয়ার অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে।'

কালভিন দ্বীপ বলতেও রানার চোখের পাতা কাঁপলো না। সব কিছুর মধ্যে বিরাটত্ব দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও। 'তোমরা যদি চক্রান্তের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারো, কলম্বিয়ান সরকার কি এক্সট্রাডিশন রিকোয়েস্ট তাড়াতাড়ি মেনে নেবে?'

'নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর, তুমুল বৃষ্টির মতো টাকা পড়ে কিনা তার ওপর। তবে, মনে হয়, মেনে নেবে।'

'আমার তাহলে একটা আইডিয়া আছে।'

'শোনা যাক।'

'প্রথমে আমি চাই আমার ফিল্ড কিট-টা আবার ভরে দেয়া হোক।'

'কোনো সমস্যা নয়,' জানালো কালভিন। 'ব্যাগটা হোটেলের সেফেই ছিলো। ওটা এখন আমাদের কাছে।'

'ষাট পাউণ্ড সি-ফোর দরকার আমার।'

'পাউণ্ড?' বিস্ফারিত হলো কালভিনের চোখ। 'রানা, এরইমধ্যে অনেকদিন হলো এখানে তুমি বেঁচে আছো।'

'ওগুলো কাল চাই আমার।'

প্রতিবাদ করলো কালভিন। 'এখানকার দোকানে ও-সব বিক্রি হয় না, রানা।'

'টমাস, চাইলে আমি ক্রেমলিনেও সি-ফোর পাচার করতে পারি। ডিটোনেটর ফিট করা না থাকলে মেটাল ডিটেকটরে ধরা পড়বে না। সি. আই. এ.-র সেই লোকটার কথা মনে নেই, গাদ্দাফির কাছে লিবিয়ায় কয়েক টন পাচার করেছিল?'

'আমাকে তোমার এডউইন পি. উইলসন বলে মনে হয়?'

'খানিকটা।'

কোনো রকমে রাগ সামলে মৃদুকণ্ঠে কালভিন বললো, 'পাবে, রানা।'

'প্রোগ্রামেবল ডিটোনেটর, কয়েকটা, কয়েক ধরনের। ব্লাস্টিং ক্যাপস। বিশ ফুট ডেটকর্ড।'

'যিশু!'

'ভালো একটা গাড়ি দরকার হবে আমার।'

'সেটা কোনো সমস্যা নয়।'

'আর দরকার হবে জ্যাক মরিসকে।'

'ওটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, রানা। তোমাকে আমি বলেছি।'

'না পারলে থাক। মুয়েলারের পিছু নেবো কারো সাহায্য ছাড়াই।'

ঝাঁঝের সাথে কালভিন বললো, 'তুমি ঠিক ইরানিয়ানদের মতো দর কষো! দাও, লবণটা দাও, তা না হলে খুন হয়ে যাবে আমার হাতে।'

'কথা দিচ্ছি, ওকে আমি ব্যথা দেবো না।'

'মিথ্যে কথা বলছো, রানা।'

'ঠিক আছে—খুব একটা ব্যথা দেবো না।'

'বেশ,' বললো কালভিন। 'দেখি কি করতে পারি।'

সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে ব্যবস্থা করলো কালভিন, সন্ধ্যায় রানাকে ফোন করলো লিলিয়ান। কালভিনের মনে সম্ভবত একটা আশাও কাজ করছে, রানাকে কোনোভাবে ক্ষান্ত করতে পারলে ওকে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো তার রক্ষা করতে হবে না। লিলির কথা শোনার সময় এ-ব্যাপারে সচেতন থাকলো রানা।

ওর শরীর সম্পর্কে জানতে চাইলো লিলি। অন্য কোনো বিষয়ে আলাপ করতে অস্বীকার করলো সে। রানা তাকে জানালো, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে ও। তারপর জানতে চাইলো লিলি, 'তুমি ফিরবে কবে?'

'তাড়াতাড়ি,' জবাব দিলো রানা।

'তাড়াতাড়ি মানে তো কাল,' বললো লিলি।

'না। কাল নয়।'

'রানা, এর কি মানে আমি বুঝতে পারি।'

'মানে হলো তোমাকে আমি নির্দিষ্ট কোনো তারিখ দিতে পারছি না।'

'অথচ কাজটা আমার। তোমার একটা কিছু হলে, নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারবো? কথা ছিলো, এন. এস. আই.-কে সব তথ্য জানিয়ে দিয়ে তুমি নিরাপদ দূরে সরে থাকবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে নিজেই ওদের পিছনে লাগতে যাচ্ছো তুমি। এ তো আমি চাইনি, রানা। শোনো, আমি দূতাবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছি। যুদ্ধ যদি করতেই হয়, আমি করবো, তুমি আমার পাশে থাকবে।'

'দূতাবাস থেকে তুমি বেরোতে পারবে না, লিলি,' বললো রানা।

'এন. এস. আই. তাদের সেরা অপারেটরদের পাহারায় বসিয়েছে ওখানে। ওখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'এন. এস. আই.-তে কোনো নোংরা লোক থাকতে পারে না বলতে চাইছো?'

'তুমিও কি ভাবো, তোমার নিরাপত্তার প্রশ্নে আমি শুধু এন. এস. আই.-এর ওপর নির্ভর করছি। রানা এজেন্সির গোটা একটা শাখা অফিস তোমার ওপর নজর রাখছে। আর, কাজটা তোমার তা সত্যি—কিন্তু এ-ও সত্যি যে কাজটা আমারও। সে ব্যাখ্যা তোমাকে আমি আগেই দিয়েছি। তাছাড়া, মুলার আন্তর্জাতিক অপরাধী, তাকে কোর্টে হাজির করা সবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর, আমি চাই না বাংলা-দেশের তরুণদেরকে খুন করুক কলম্বিয়ার কোকেন।'

ফুঁপিয়ে উঠলো লিলি।

'লিলি!'

'চুপ করো!'

ধমক খেয়ে নির্দেশ পালন করলো রানা। খানিক পর নিজেকে সামলে নিলো লিলি, রাগের সাথে বললো, 'এক্সকিউজ মি। কিন্তু তুমি আমাকে বন্দী করে রাখবে এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। এখন বুঝতে পারছি, তোমার সাথে যোগাযোগ করতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল।'

'কেন?'

'তুমি একটা সুইসাইড মিশন বেছে নিয়েছো। আমার কথা বিশ্বাস করো, রানা। প্লিজ। ফিরে এসো।'

'তা নয়,' বললো রানা। 'এখন অন্তত ব্যাপারটা সুইসাইড মিশন নয়। সে পর্যায় পেরিয়ে এসেছি।'

সাত

ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির তরুণ এজেন্ট অনেকক্ষণ হলো চোখে শর্ষে ফুল দেখছে। গলার ভেতর রক্ত আর ভাঙা দাঁতের টুকরো আটকে যাওয়ায় বিষম খেলো বার কয়েক। রানার বাম কব্জি আর আঙুলে ব্যাণ্ডেজ থাকলেও, বিস্ফোরণে ডান হাতের যে কোনো ক্ষতি হয়নি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলো জ্যাক মরিস। তার নাকটা বাঁ কানের দিকে ঘুরে গেল। চোয়ালটাতেও বোধহয় ফাটল ধরেছে, অবশ্য কথা বলতে অসুবিধে হলে কাজটা রানা ভালো করেনি। তবে পেন্সিল আর কাগজ সব সময় ওর সাথেই থাকে।

'শুরু করার আগে দুটো জিনিস জানা দরকার তোমার,' বললো রানা। 'ডি. ই. এ.-তে তুমি নেই। আমার সাথে পাঁয়তারা কষলে দুনিয়াতেও থাকবে না।'

খানিকটা রক্ত আর ভাঙা দাঁতের কিছু টুকরো উগরে দিলো মরিস। সুন্দর সাদা শার্টটা নোংরা করে ফেললো। সেদিকে কয়েক সেকেণ্ড এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'দ…থ্,' বললো সে, তারপর শুদ্ধ করলো, 'দাঁত।'

'মনোযোগ দাও, মরিস।'

রানার দিকে আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে তাকালো মরিস, তবে নিজের অবস্থা সম্পর্কেও সচেতন সে। সন্দেহ নেই, টমাস কালভিন-কেও ঘৃণা করছে, শহরের পনেরো কিলোমিটার দূরে এই নির্জন জায়গাটায় তাকে আসতে বলায়। জায়গাটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বললে ভুল হবে না—পাহাড়ের একটা কাঁধের ওপর, নিচের ঢালু উপত্যকায় কফি চাষ হয়, কোথাও কোনো বাড়ি-ঘর চোখে পড়ে না। তার ভাগ্য তাকে এখানে টেনে এনেছে, বুঝতে পারছে সে। 'বলুন, আমি শুনছি।'

'আমার নাম বলো।'

'পল ওয়ারেন।'

'এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি। আমার নাম কি?'

'মাসুদ রানা।'

'চিড়িয়াখানায় যখন দেখা হলো, তখনও তুমি আমার নাম জানতে।'

'আপনার নাম সবাই জানে,' বললো মরিস। 'তা না হলে আপ-নাকে দেখিয়ে দিতে পারলে দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার ফী দেয়ার কথা বলা হবে কেন।'

নিজের দাম জানতে পারাটা মন্দ নয়, ভাবলো রানা। তবে, অঙ্কটা আরও বেশি হলে খুশি হতো। প্রশ্ন হলো, মেডিলিনে ওর আসার কথাই যেখানে কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সেখানে ওর দাম নির্ধা-রণ করা হয় কি করে? 'ফীর কথা তুমি জানতে পারলে কিভাবে?'

'দূতাবাসের এক লোক আমাকে বলেছে।'

'এক লোক ?'

'ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের সেকেণ্ড সেক্রেটারি,' বললো মরিস, জানে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার উপায় আছে রানার। 'বোগোটা থেকে এলো ব্যানানা ক্রপ পরীক্ষা করার জন্যে, আপনি আসার এক-দিন আগে।'

সি. আই. এ.। একটা অপরাধ ঢাকার জন্যে নিজেদের লোককে দিয়ে আরেকটা অপরাধ করতে ভয় পাচ্ছে। তবে মুখ খুলতে তো আর অসুবিধে নেই, বিশেষ করে যদি রেকর্ড করা না হয়। মেডিলিনে শুধু একটা কথা ছড়িয়ে দিয়েছে ওরা, ববি মুয়েলারকে যে লোক খুন করেছে, আগামী কাল আসছে সে—এই তার নাম, এই তার চেহারার বর্ণনা। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো নিজেদের গরজেই ব্যবস্থা নেবে, ল্যাংলি থেকে যাবে ধোয়া তুলসী পাতা। কিন্তু, সি. আই. এ.-ই বা জানলো কিভাবে, আসছে ও? রানা বুঝলো, এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয় এখন। জানার অনেক উপায় আছে, বিশেষ করে এসপিওনাজ জগতে বেঈমানী বা তথ্য কেনাবেচা যখন সাধারণ একটা ব্যাপার। 'তার ভাব দেখে মনে হয়েছে, তুমি আমাকে চিনিয়ে দিতে পারলে কারো একটা উপকার করা হবে?'

'হ্যাঁ,' বললো মরিস। 'সরাসরি কিছু বলেনি।'

সি. আই. এ.-র বেশিরভাগ কাজেই সূক্ষ্ম কৌশল আর চাতুর্য থাকে। কাউকে খুন করার সিদ্ধান্তে যে লোকটা সই করে তার সম্ভবত আধুনিক কাব্যে ডিগ্রী নেয়া আছে। 'টাকাটা কার পকেট থেকে বেরোলো?' জানতে চাইলো ও।

'এমন কেউ হবে যে আপনাকে চেনে,' বললো মরিস। 'তাদের উদ্দেশ্য আছে।'

'নাম আর ঠিকানা দরকার আমার।'

মুখটা আবার পরিষ্কার করলো মরিস, পায়ের কাছটায় এক রাশ থুথু ফেললো। 'আমাকে যে টাকা দিয়েছে তার নাম ডুলি হারমোড।'

নামটা রানার কাছে অর্থহীন। অন্য কিছু আশাও করেনি ও। 'কে সে?'

'একজন সুবিধাভোগী,' বললো মরিস। 'রাস্তায় বাসুকো বিলি করে।'

'বাসুকো?'

'শুকানো কোকেন,' বললো মরিস, 'পরিশোধিত নয়। সস্তা।'

'তার আর কতোটুকু দৌড়।'

কাঁধ ঝাঁকাতে যাচ্ছিলো মরিস, ব্যথা পাবে ভেবে ক্ষান্ত হলো। 'নগণ্য একজন ককেরস সে।'

'টাকাটা তাহলে তার পকেট থেকে আসেনি।

'হয়তো তাই।'

'কার পক্ষে কাজ করে ডুলি হারমোড?'

'কার্টেল, আবার কার!'

'নির্দিষ্ট করে বলো।'

'আমি জানি না,' বললো মরিস। 'এ-ধরনের ডিসট্রিবিউটররা অনেকেই হপ্তা শেষে চেক পায় না। যে-কেউ তাকে ভাড়া করে থাকতে পারে।'

'সাধারণত কার কাজ করে সে?'

কার্টেল ভুক্ত কারো নাম উচ্চারণ করতে রাজি নয় মরিস, আর সবার মতোই। শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়লো সে। 'আপনি তাকেই বরং জিজ্ঞেস করুন।'

'করবো,' বললো রানা। 'কোথায় থাকে তোমার কাছ থেকে জানার পর।'

নিশ্চয়ই হাসতে চেষ্টা করলো মরিস, ক্ষতে টান পড়ায় আরো রক্ত ও আবর্জনা বেরোলো মুখ থেকে, চেহারা হলো রক্তচোষক বাদুড়ের মতো। 'চোদ্দ শিঁকে খবর নিন,' বললো সে। 'তিন দিন আগে পুলিশ তাকে জেলে ভরেছে।'

মরিস সত্যি কথা বলেছে বুঝতে পেরে সামান্যই অবাক হলো রানা। কয়েকটা নারকোটিক আইন ভাঙার অভিযোগে ডুলি হারমোডকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার পেশায় এটাকে একটা দুর্ঘটনাই বলতে হয়, রানাকে খুন করার চেষ্টার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে পরদিন সকালে হারমোডের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করলো কালভিন। একাধিক সরকারী মহলের সাহায্য চাইতে হলো ওকে, কারণ ডি. এ. এস. স্থানীয় পুলিশকে বিশ্বাস করে না, স্থানীয় পুলিশ বিশ্বাস করে না জেলারদের, আর জেলখানায় গুরুত্বপূর্ণ বন্দী থাকলে জেলাররা সব সময় প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

ডুলি হারমোড গুরুত্বপূর্ণ বন্দী না হলেও, তার মানিব্যাগে যথেষ্ট বারুদ আছে, ফলে ওয়ার্ডেন থেকে শুরু করে ব্লক সুপারিনটেনডেন্ট পর্যন্ত সবাই চোখে পড়ার মতো উদ্বিগ্ন। শেষ চরিত্রটি, মোটাসোটা ও বিশালবপু, বাম বাইসেপ-এর সাথে চেইনে আটকানো চাবির গোছা নিয়ে পথ দেখালো রানা আর কালভিনকে। সেলে ঢোকার সময় তার ভাব দেখে মনে হলো, যেন অন্য কোথাও উপস্থিত রয়েছে সে এই মুহূর্তে কি করছে জানে না—অন্যমনস্ক ও নির্লিপ্ত।

বেশ আরামেই রাখা হয়েছে হারমোডকে। তার সেলে দুটো

জানালা, রেডিও, খবরের কাগজ, ট্রে ভর্তি খাবারদাবার, একটা চেয়ার, নরম বিছানা, কি নেই। দরজা খুলে জেলার বললো, 'ওহে, কালভো!'

কালভো অর্থাৎ ন্যাড়া বলেও ডাকা হয় ভুলি হারমোডকে। তার সবচেয়ে ভালো জিনিস সম্ভবত ওই একটাই, মাথার মাঝমধ্যিখানে তেল চকচকে মস্ত টাক। মুখে প্রকৃতির নির্দয় অত্যাচারের চিহ্ন, গুটিবসন্তের দাগ। একটা খয়েরি, একটা সোনালি, এভাবে সাজানো হয়েছে দাঁতগুলো। নাকটা যেন স্থানচ্যুত অস্ত্র, ঠিক যেন একটা শমশের।

সেল থেকে বেরিয়ে গেল জেলার, ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। দু'পা এগিয়ে হারমোডের চেয়ারের সামনে পৌঁছুলো রানা, একটা হাত বাড়িয়ে দিলো লোকটার কানের পিছনে, যেন মজার কোনো কৌশল বা জাদু দেখাতে যাচ্ছে, তারপর কানটা শক্ত করে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো। চেয়ার ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়লো হারমোড, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারলো রানা, ছিটকে দেয়ালে গিয়ে পড়লো সে।

ইটে যেন একটা ডিম বাড়ি খেলো। হুস শব্দে বেরিয়ে গেল ফুসফুসের বাতাস, দেয়াল থেকে খসে পড়লো মেঝেতে শরীরটা, বসার ভঙ্গি নিয়ে স্থির হয়ে থাকলো। একটা শব্দও করেনি। তবে চেহারায় ভাবটুকু একটুও বদলালো না, রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো তাচ্ছিল্য ও জেদ মেশানো গাম্ভীর্য নিয়ে।

কালভিনও কিছু বললো না। হারমোডের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে, লোকটার অস্তিত্ব সম্পর্কেই যেন সচেতন নয়। তিন মিনিট বেধড়ক মার খাবার পর কথাটা চিৎকার করে বললো হারমোড, গলার সুরে ঘৃণাটুকু চাপা থাকলো না, 'গুদ দে, ফরেনার!'

চওড়া হাসি ফুটলো কালভিনের মুখে। 'ভুল, দোস্ত কালভো। তোমার জন্যে দিনটা আজ—ব্যাড। কারণ, আমি এখনো শুরু করিনি।'

একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো রানা।

ওর দিকে ভুলেও তাকালো না হারমোড। খোলা একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে বললো, 'রেডিওতে শুনেছি আমরা বৃষ্টি আশা করতে পারি। যদিও সেটা তেমন মন্দ নয়।'

'নির্ভর করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর,' বললো কালভিন। 'ডানবেরির ফেডারেল জেলখানায় কখনোই বৃষ্টি হয় না। শীতের সময়, তুমি যদি উঠনে থাকো, পাহাড়ের গায়ে বড়জোর তুষার দেখতে পাবে। দীর্ঘদিন ওতেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কালভো। পাহাড়ে তুষার, কিন্তু অনেক দূরে।'

'ডানবেরি,' বললো হারমোড। 'কোথায় জায়গাটা?'

'মায়ামির উত্তরে।'

'যুক্তরাষ্ট্রে, সত্যি?'

'কানেকটিকাট রাজ্যে, কালভো। বছর কয়েকের জন্যে ওখানেই তোমাকে থাকতে হবে।'

ভয় যদি পেয়েও থাকে, হারমোডের ক্ষতবিক্ষত চেহারায় সেটা প্রকাশ পেলো না। হাত তুলে মুখ ঘষলো সে। 'আমি কলম্বিয়ার নাগরিক,' বললো সে। আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এখানে—অপরাধ করার জন্যে। এ-ব্যাপারে আপনার নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই, মিঃ ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।'

'বিলি করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ কোকেন সহ ধরা পড়েছো তুমি, কালভো। সেজন্যেই তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তুমি

গ্রেফতার হবার পর তোমার আরো একটা অপরাধের কথা জানা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিককে খুন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছো তুমি।' ইঙ্গিতে রানাকে দেখালো কালভিন। 'এই সেই ভদ্রলোক যাকে তুমি হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে সফল হওনি।'

রানার দিকে তাকালো হারমোর্ড, এতো মার খাবার পর'ও তার ভাব দেখে মনে হলো ওকে যেন এই প্রথম দেখছে। 'অসম্ভব!' বললো সে। 'প্রথম কারণ, খুন করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছি, এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি।'

'তারমানে তোমার সেই আগের যোগ্যতা আর নেই, খ্যাতি নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার পৌরুষের বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র অপমান নয়। আমার কথা অবিশ্বাস করো না—তোমাকে মার্কিন জেলে রাখা হবে নিগ্রোদের সাথে। সবাই তারা রেপিস্ট। নারী বা পুরুষ, কোনো বাছ বিচার করতে অভ্যস্ত নয় তারা। তখনো যদি তোমার মর্যাদা বলে কিছু থাকে, নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারো ওদের হাতে পড়লে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।'

কালভিন বেশি সময় নিচ্ছে, ভাবলো রানা। তবে লক্ষ্য করলো, কথাগুলো শুনে অস্থির হয়ে উঠলো হারমোড। 'কি প্রমাণ আছে, এই ভদ্রলোককে খুন করতে চেয়েছি আমি?'

''জ্যাক মরিসকে একটা তথ্যের জন্যে আড়াই লাখ ডলার দিয়েছো তুমি। সেই তথ্য হাতবদলের পরিণতিতে ওর ওপর হামলা চলে।'

সেলটা ঠাণ্ডা হলে'ও ঘামতে শুরু করলো হারমোড। দু'হাত দিয়ে মুখ মুছলো সে। 'কিন্তু আগে তো এক্সট্রাডিশন চুক্তি সই হতে হবে, তাই না?'

মিথ্যে বললো কালভিন, 'তুমি দেখছি কিছুই জানো না। প্রেসি-

ডেণ্ট আজই ওটায় সই করবেন। ঠিক করেছি আজ বিকেলেই তোমাকে পাঠানো হবে বোগোটার জেলখানায়। ওখানে জেলার হিসেবে নতুন একজনকে আনা হয়েছে, শুনেছি তাকে নাকি ঘুষ খাওয়ানো সম্ভব নয়। ওখানে তোমাকে রাখা হবে—দু'দিন, বড়জোর। তারপর যুক্তরাষ্ট্রে, ডানবেরিতে, নিগ্রোদের কাছে…।'

এরপর মিথ্যে বললো হারমোড, 'আমি আমার উকিলের সাথে দেখা করতে চাই।'

'জেলখানার অফিসারদের বলে দেখতে পারো,' বললো কালভিন। 'তোমার অনুরোধ ওরা রাখতেও পারে। কিন্তু ততোক্ষণে এখানে আমি থাকবো না। আপোস প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে।'

'আপোস! কি আপোস?'

'কথাই এখন সবচেয়ে দামী কারেন্সি, কালভো। খরচ করার আর কিছু নেই তোমার।'

ভাঁজ করা হাঁটু দুটোর মাঝখানে মাথা নিচু করলো হারমোড। খানিক পর মুখ তুলে বললো, 'প্রস্তাবটা কি?'

'তোমাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবার অনুরোধ বাতিল করা হবে।'

'আমি চাই আমার বিরুদ্ধে বাকি সব অভিযোগও তুলে নেয়া হোক।'

'সেটা আমার ব্যাপার নয়, কালভো। ওদিকটা তোমার সামলাতে হবে নিজের লোকদের সাহায্য নিয়ে।'

খানিক পর মাথা ঝাঁকালো হারমোড। 'কি জানতে চান আপনারা?'

'নামটা। খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল যে লোক।'

হাসলো হারমোড। 'আপনারা আসলে কোনো পুরুষকে খুঁজছেন

না,' বললো সে। 'তার নাম লুসিয়া সানসেজ। ওরা তাকে লা ব্লাংকা বলে—হোয়াইট লেডি। কিন্তু আসলে সে কালো।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?' জানতে চাইলো রানা, ওর প্রথম প্রশ্ন।

মেঝেতে বসেই কাঁধ ঝাঁকালো হারমোড। 'শহরে তার অ্যাপার্ট-মেণ্ট আছে, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন,' বললো সে। 'তার বাড়ি অবশ্য এনভিগাডোয়। একটা শ্যালে আছে মানিজালেস-এ। কিংবা তার বোগোটার বাড়িতে খবর নিতে পারেন। বোগোটায় বা পোর্ট-অ-প্রিন্স-এর বাড়িতে।'

'আন্দাজ করো,' বললো রানা। 'নির্ভুল হওয়া চাই।'

'শুনেছি শহরেই নাকি আছে সে।'

লুসিয়া সানসেজ, দি হোয়াইট লেডি, তার অ্যাপার্টমেন্টে না থাকলেও, কামরাগুলো দেখে আভাস পাওয়া গেল কিছুক্ষণ আগেও এখানে ছিলো সে। বিল্ডিংটা নাটিবারা পাহাড়ের কাছে, সতেরোতলা, প্রতিটি তলা থেকে রিয়ো মেডিলিন দেখা যায়। নিরাপত্তার ব্যবস্থা বলতে একজন মাত্র বুড়ো লোক লবিতে পাহারায় আছে, অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় সাধারণ একটা কী অ্যালার্ম। ঠিক বুঝতে পারলো না রানা, কারণটা স্রেফ অবহেলা, নাকি ধরে নেয়া হয়েছে তাকে স্পর্শ করতে পারে এমন বাপের ব্যাটা এখনো কলম্বিয়ায় জন্মায়নি?

এরা কাউকে ভয় করে বলে মনে হয় না, শুধু পরস্পরকে বাদে। প্রত্যেকের সাথে এক বা একাধিক পিস্তোলেরস অর্থাৎ পিস্তলবাজ থাকে, এ থেকেই বোঝা যায় প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকা আছে। লুসিয়া সানসেজ কার্টেলের দ্বিতীয় সারিতে পড়ে, মর্যাদা অনুসারে

প্রাপ্য লাভ ও সুবিধে পুরোপুরি ভোগ করে সে। সাধারণত সাবেক এক ফুটবল তারকার সাথে চলাফেরা করতে দেখা যায় তাকে, নাম অ্যাভারতি হুয়ারেজ। সাথে দু'জন বডিগার্ড থাকে, পাশ ছেড়ে বড় একটা নড়ে না। তাদের মধ্যে একজন হণ্ডুরান, ভালো হাত পাকিয়েছে খুন-খারাবিতে। অপর লোকটা আদিবাসী ইণ্ডিয়ান, ম্যাচেটি চালনায় তার খ্যাতি আছে।

ম্যাচেটিটা আসলে লোক দেখানো ব্যাপার, বলা হয়েছে রানাকে। কাউকে যদি স্রেফ খুন করার দরকার হয়, আঘাতটা করা হবে আধুনিক কোনো পদ্ধতিতেই, সাধারণত ইয়ামাহা বাইকের পিছন থেকে। আর যদি কাউকে মেসেজ পাঠাবার বা দৃষ্টান্ত স্থাপনের দরকার হয়, ইণ্ডিয়ান লোকটা তখন তার ম্যাচেটি ব্যবহার করবে—একেকবারে একটা করে টুকরো কেটে নেবে সে। নির্দিষ্ট কিছু টুকরো পাঠিয়ে দেয়া হবে লোকটার পরিবারে, বাকিগুলো উপহার দেয়া হবে তার গার্লফ্রেণ্ডকে।

টেবিলে বসে আপোস রফায় ব্যর্থ হলে, প্রতিপক্ষরা যখন হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, ডাক পড়ে হণ্ডুরানের। সিক্রেট পুলিশ, ডি. এন. আই.-এ চাকরি করেছে সে, এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট হিসেবে। হোয়াইট লেডির কাজ করতে এসেছে দ্বিগুণ বেতনে। উপরি পাওনা কোকেন আর নিত্য নতুন মেয়েমানুষ। সাধারণত অবসরকালীন ভাতাদি একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের প্রথম উদ্বেগ নয়।

হণ্ডুরানের প্রথম প্রেম সি-ফোর। কারণটা বুঝতে পারে রানা। [illegible] কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতায় সি-ফোর বা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ অত্যন্ত [illegible]যোগ্য, ব্যবহার করা সহজ, সহজ বহন করাও। জিনিসটা পুটিং-[illegible], যে-কোনো আকৃতি দেয়া যায়। চ্যাপ্টা করে নাও, একটা [illegible] ভরতে পারবে, তৈরি হয়ে গেল লেটার বম। যে-কোনো

আবহাওয়ায় দীর্ঘদিন, মাস বা বছর রেখে দিলেও সি-ফোর নষ্ট হয় না, গুণগত মান একইরকম থাকে।

হুণ্ডুরানের মতো রানাও সি-ফোর পছন্দ করে। চারটে কামরার সব ক'টাতে জিনিসটা লুকালো রানা, বেশি করে রাখলো লিভিংরুম, পাশের ডাইনিংরুম আর কিচেনে। অ্যাপার্টমেণ্টটা অত্যন্ত রুচিকর-ভাবে সাজানো। লিভিংরুমের গোটা একটা দেয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে ম্যাডোনোর পেইন্টিং। ফার্নিচারগুলো বেশিরভাগই দুধসাদা। বেডরুমে রয়েছে নগ্ন একটা নারীমূর্তি, শ্বেতপাথরের। টেবিল আর শেলফে রাখা মদের বোতল আর গ্লাসগুলো যে-কোনো বিলাসী ধন-কুবেরকেও ঈর্ষান্বিত করবে। বিরাট একটা কাঁচের দরজা দিয়ে টেরেসে যাওয়া যায়, কাঁচটা বুলেটপ্রুফ।

কালভিনের কাছ থেকে রানা জানতে পেরেছে, লুসিয়া সানসেজ প্রায় এক দশক হলো কোকেন ব্যবসার সাথে জড়িত। আর সবার মতোই শুরু করেছিল সে; খেটে খাওয়া একটা মেয়ে, এমন একজনকে ভালোবাসে যার সাথে পুলিশের সম্পর্ক ভালো নয়। প্রেমিক গ্রেফতার হলো, বিচারের জন্যে তাকে আনা হলো কোর্টে। প্রেমিকা ওয়েটিং-রুমে বসে আছে, এই সময় উদয় হলো রহস্যময় এক লোক। সে জানালো, বিচারকের সাথে তার খাতির আছে, লুসিয়া অনুরোধ করলে তার প্রেমিকের জন্যে চেষ্টা করতে পারে সে, যদি লুসিয়া তার একটা উপকারে আসে।

এভাবেই নতুন পরিচয় পেলো লুসিয়া সানসেজ—বাহক। জানা যায়, কোকেন নিয়ে পঁচিশবার যুক্তরাষ্ট্রে গেছে সে, একবারও ধরা পড়েনি। নতুন নতুন কৌশলে কোকেন বহন করতো সে। একবার নাকি কোকেন ভরা একশোটা কনডোম গিলে ফেলে, তারপরও তার

চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র ছিলো না। কনডোমগুলো পেটের ভেতর ছিঁড়ে গেলে মৃত্যু যন্ত্রণাটা কি ভয়াবহ হতো ভাবাই যায় না।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়, কলম্বিয়ার ড্রাগ ব্যবসায়ীরা তখনো সুসংগঠিত নয় বলে, লুসিয়ার মতো একটা মেয়ের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব হলো। অন্যের কোকেন বহন করা ছেড়ে দিয়ে নিজেই ব্যবসায় নেমে পড়লো সে। কোর্ট আর ট্যুরিস্ট হোটেল থেকে নিজের জন্যে বাছাই করলো সাহসী কয়েকজন বাহককে।

কিছুদিন পর দেখা গেল, ধর্মীয় শিল্পকর্ম নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে লুসিয়া সানসেজ। ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর ভার্জিন মেরীর মূর্তি বিক্রি করে তার কোম্পানী। ফ্লোরিডায় তার অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টে হানা দিলো পুলিশ, ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে গেল। একের পর এক নতুন ব্যবসা ধরলো লুসিয়া—কলম্বিয়া-পূর্ব যুগের মৃৎশিল্পে কোকেন ভরলো, কোকেন ভরলো সাপের পেটে, রফতানীযোগ্য মূল্যবান কাপড়ের চওড়া পাড়ে ব্যবহার করলো কোকেনের জমাট সলিউশন।

আশির দশকের শুরুতে মন্দা দেখা দিলো ব্যবসায়, সেই সাথে মাথা চাড়া দিলো কার্টেল প্রথা। ফ্রি ল্যান্সারদের জন্যে সাপ্লাই কমে গেল, কারণ বড় অপারেটররা যেখানে যতো কোকেন পাওয়া যায় সব কিনে নিতে শুরু করলো। রফতানী বাজার থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয়া হলো লুসিয়াকে, বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাজারের জন্যে ব্যবসা শুরু করতে হলো তাকে। কিছু এলাকা তার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হলো, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাটা অবশ্য তার দায়িত্ব।

নিজের স্বার্থরক্ষায় পুরোপুরি সফল হলো লুসিয়া। যে-কোনো পুরুষের মতোই নিষ্ঠুর ও কৌশলী হিসেবে নাম কিনলো সে। কোনো প্রতি-দ্বন্দ্বী বা শত্রু যদি তার প্রতি সম্মান না দেখায়, বিরাট ক্ষতি স্বীকার

করে বুঝতে পারবে ভুলটা কোথায় করেছিল সে। ভুল বুঝতে পারার সুযোগ সবাই পায় না, বেশিরভাগই খুন হয়ে যায়।

এ-ধরনের কোনো ভুল করার ইচ্ছে রানার নেই। লুসিয়ার অ্যাপার্টমেণ্টে কাজ সেরে রাস্তার উল্টোদিকে, সরাসরি সামনের একটা বিল্ডিঙে চলে এলো ও। দুটো বিল্ডিঙের কাঠামো একই ধরনের, দ্বিতীয়টাও সম্ভবত অ্যাপার্টমেণ্ট ভবন হিসেবেই তৈরি করা হচ্ছে, তবে বিশ কি তিরিশ ফুট খাটো। শ্রমিকরা আজকের মতো বিদায় নিয়েছে, খাঁ-খাঁ করছে গোটা বিল্ডিং।

অন্ধকার হতে এখনো এক ঘণ্টা দেরি আছে, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলো রানা। বিল্ডিঙের পাশে এলিভেটর আছে, ব্যবহারের জন্যে জেনারেটর চালু করার ঝুঁকি নিতে হবে। তা না করে, হাতে তৈরি বাঁশের ঢাল বেয়ে উঠলো রানা, কয়েকবারে। হাত আর মাথার ব্যথাটা বাড়লো ওর। ঝুঁকিও কম নয়, কারণ কলম্বিয়ায়, বাংলাদেশের মতোই, নিরাপত্তার মানদণ্ড বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। একটা করে বাদ দিয়ে প্রতি তলায় ডেক বা নেট থাকা উচিত, কিন্তু নেই, যে-কোনো ছাদ থেকে খসে নিচে পড়ার প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

তেরোতলায় উঠে একটা জায়গা পছন্দ হলো রানার। দেয়াল তোলা হয়েছে, ছাদও আছে, শুধু জানালায় কাঁচ বা কবাট নেই। এই একটা ফ্লোরে সম্প্রতি কোনো কাজ করা হয়নি, অন্তত বর্তমানে করা হচ্ছে না। আবার মই বেয়ে নিচে নামতে হলো ওকে।

কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ধারণা নেই রানার। নিচে নেমে এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলো ও, রাস্তার দিকে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত কাঁচ ঢাকা জানালা ওটার একটা বৈশিষ্ট্য, ভেতরে বসে রাস্তার উল্টোদিকে লুসিয়ার অ্যাপার্টমেণ্টটা দেখতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যের

আগে পৌঁছুতে পারায় যে-টেবিলটা দরকার সেটাই পেলো ও। জার্মান খাবার পরিবেশন করা হয় এখানে, কলম্বিয়ান কোনো ওয়াইন পাওয়া যায় না।

ফল আর কফি নিয়ে দু'ঘণ্টা পার করে দিলো রানা। কালভিনকে কিছু জানায়নি ও, তবে সে যে কিছু আন্দাজ করতে পারেনি তা নয়। জানায়নি, কারণ ঘটনাটা যদি মারাত্মক কোনো দিকে মোড় নেয়, সংশ্লিষ্ট থাকার কথা সরাসরি অস্বীকার করবে ডি. ই. এ.। রানার শুধু একটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কেউ যেন ওকে দেখতে না পায়।

আরো দশ মিনিট কাটলো। বিল মিটিয়ে দিয়েছে রানা, একটা কিউবান সিগার ফুঁকছে, এই সময় তুষারধবল একটা সিলভার শ্যাডো ঠিক যেন পাপ আর অনাচারের বিজ্ঞাপন হিসেবে উদয় হলো রাস্তায়। ওটার পিছু পিছু, বিল্ডিঙের পিছন দিকের গ্যারেজে ঢুকলো গাঢ় নীল একটা হোণ্ডা প্রিলিউড।

কালভিন ওকে একটা চেরোকী দিয়েছে, জানালায় টিনটেড কাঁচ। স্টার্ট দিয়ে রাস্তা বদল করে পাশের লেনে চলে এলো ও, পার্কিং লটের উল্টোদিকটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে।

চারজন ওরা। মেয়েটার পরনে সাদা ওয়েট স্যুট বলে মনে হলো, সম্ভবত আটশো ডলার দিয়ে কেনা, মেয়ে অ্যাথলেটদের জন্যে সর্বশেষ ফ্যাশন। কালভো ঠিক বলেনি, লুসিয়া সানসেজ ঠিক কালো নয়, শ্যামলা। তার চোয়ালের চ্যাপ্টা হাড় আর চওড়া মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না শরীরে ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে। কালো চুল। ঠোঁটে এমন একটা শেড ব্যবহার করা হয়েছে, দূর থেকে কালচে লাগলো। চোখ দুটো দেখার সুযোগ হলো না রানার, তবে আন্দাজ করলো জ্যান্তই হবে।

লুসিয়ার ওপর মনোযোগ, তাই বাকি তিনজনের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলো না রানা। ছোটোখাটো লোকটা, হাসিখুশি ভাব নিয়ে হাঁটছে, শরীরটা নিরেট পাথর যেন, পরনের কাপড়চোপড় সাধারণ কিন্তু দামী, সম্ভবত ফুটবল তারকা হবে—অ্যাভারতি হুয়ারেজ। হোয়াইট লেডির পাশে রয়েছে সে। সামনে আর পিছনে পাহারায় রয়েছে দু'জন বডিগার্ড।

কাছাকাছি যেতে চায় না রানা, দূর থেকেই দেখলো অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের লবিতে ঢুকলো দলটা। উত্তেজিত অবস্থায় অপেক্ষা করছে ও, খানিক পর গাড়িতে বসেই দেখতে পেলো লুসিয়া সানসেজের অ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলে উঠলো। রানা ভাবলো, দু'হপ্তা চারদিন আগে কেউ একজন, সম্ভবত হুগুরান ব্যাটা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ওর স্যুইটে কখন আলো জ্বলে ওঠে দেখার জন্যে।

চেরোকি নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এলো রানা, খানিকটা এগিয়ে একটা ফার্মেসীর পাশে গাড়ি থামলো। ফার্মেসীর ভেতর, দরজার কাছেই ফোনটা। লুসিয়া সানসেজের নম্বরে ডায়াল করলো ও।

তিন বার রিঙ হবার পর রিসিভার তুলে এক লোক হেঁড়ে গলায় বললো, 'হুয়ারেজ।'

তারমানে ফুটবলার। রানা বললো, 'সিনোরিটা সানসেজকে দরকার আমার।'

লোকটা ওকে পাত্তা দিলো না। জানতে চাইলো, 'কে কথা বলছে, কি দরকার?'

'হোয়াইট লেডিকে বলো আমি মাসুদ রানা,' বললো রানা। 'আমাকে যদি চিনতে না পারে, বলো আমিই সেই বান্দা যাকে বিষাক্ত ফলটা অফার করা হয়েছিল। বলো, ভূতের সাথে কথা বলার সুযোগ

সব সময় পাওয়া যায় না।'

কথা না বলে মাউথপীসে নিঃশ্বাস ছাড়লো লোকটা। নামটা হয়তো তার জানা। হঠাৎ করে নিঃশ্বাস বন্ধ করলো সে, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো, তবে ক্রেডলে নয়।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অসহনীয় লাগলো রানার। লুসিয়া সানসেজ কি করবে তার ওপর নির্ভর করছে ওর প্ল্যান আর মেয়েটার জীবন। যে-কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখে মেয়েটা, কিন্তু এই মুহূর্তে যদি তার ব্যত্যয় ঘটে, মারাত্মক পরিণতির দিকে মোড় নেবে ঘটনা। এক দুই করে প্রায় ষাট সেকেণ্ড গুণে ফেললো রানা, তারপর মৃদু নারীকণ্ঠ শুনতে পেলো।

মধুর বলা যাবে না, তবে যৌনাবেদনে কোনো কমতি নেই তার কণ্ঠস্বরে। 'হ্যালো?'

'ভালো তো, লা ব্লাংকা?' স্প্যানিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বলা হয় আত্মারা নাকি যে-কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে। তবে বিদেশী উচ্চারণে স্প্যানিশ বলার দরকার নেই। তুমি ইংরেজিতে বলো, মিঃ মাসুদ রানা।'

'ধন্যবাদ,' বললো রানা। 'তোমার সাথে আমার কিছু জরুরী কথা হওয়া দরকার।'

গলা শুনে মনে হলো সামান্য হাসলো মেয়েটা। 'কি কথা?'

'আমার বিশ্বাস, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ব্যবসায়ী। হিসাবে গরমিল ধরা পড়লে তুমি নিশ্চয়ই তা শুধরে নিতে চাইবে। তোমার কাছে কিছু পাওনা আছে আমার। অনুরোধ করছি, দেনাটা শোধ করো।'

হেসে উঠলো হোয়াইট লেডি। স্বতঃস্ফূর্ত, হৃদয় থেকে উথলে ওঠা আনন্দধারা। 'কিন্তু, মিঃ রানা, আমরা বোধহয় দুটো আলাদা ব্যবসায়ে

আছি।'

'হয়তো তাই, লা ব্লাংকা। কিন্তু পরস্পরকে আমরা চিনেছি।'

'তুমি যদি আমাকে চিনেই থাকো, তো কি হলো?'

'চিনি বলেই জানি, তুমি জানো কে আমাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছে,' বললো রানা। 'আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, উত্তর না দিলে খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে তুমি।'

আবার হাসতে শুরু করলো লুসিয়া সানসেজ, তবে সিদ্ধান্ত পাল্টালো। 'তুমি এতোটা নিশ্চিত—তাড়াতাড়ি মারা যাবো আমি?'

'প্লিজ, টেরেসের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাও,' বললো রানা। 'পর্দা থাকলে সরিয়ে দাও।'

'সরানোই আছে।'

পকেট থেকে হাতটা বের না করেই রেডিও-নিয়ন্ত্রিত ডিটোনেটরের বোতামে চাপ দিলো রানা। শব্দটা পেলো ও, পাশের বাড়িতে যেন একটা দরজা বন্ধ হলো, তবে ফার্মেসীতে ভেতর থেকে দেখতে পেলো না কিছুই।

দেখার দরকারও নেই। যা দেখার দেখতে পাচ্ছে হোয়াইট লেডি। আড়াই শো গজ দূরে, টেরেসের সরাসরি উল্টোদিকে, আধা তৈরি বিল্ডিঙের তেরোতলাটা অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো। সময়ের একটা হিসাব করে চুপ থাকলো রানা, তারপর বললো, 'স্রেফ একটা নমুনা, লা ব্লাংকা। ঠিক জবাবটি না পেলে এরকম আরো ঘটনা ঘটবে।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি,' উত্তেজনায় ফিসফিস করে বললো লুসিয়া সানসেজ।

'কিন্তু বুঝতে পারছো কি যে এরপর ঘটনাটা ঘটবে তোমার খুব কাছাকাছি?'

হোয়াইট লেডি তার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখলো। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে তা বিশ্বাস করতে হবে?'

'লা ব্লাংকা সি-ফোরে বিশ্বাস করে,' বললো রানা। 'আমি জানি।'

লুসিয়া কিছু বললো না।

'বোকার মতো মৃত্যুকে ডেকে এনো না। আমার কথা শোনো, বেঁচে যাবে—কথা দিচ্ছি। তোমার অ্যাপার্টমেন্টে যে চার্জগুলো বসিয়েছি, ওগুলো মোশন সেনসিটিভ। কোনো অবস্থাতেই ওগুলোকে ডিসটার্ব করা যাবে না। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর থাকতে হবে তোমাদের, কারণ দরজা খুললে বিস্ফোরণ ঘটবে। এমনভাবে তার জড়ানো হয়েছে, করিডরের দিকে দরজাটা দ্বিতীয়বার খুললে চার্জগুলো অ্যাকটিভেট করা হবে। ভেতরে থাকো তোমরা, বেশি নড়াচড়া করো না।'

'কাওয়ার্ড,' বললো লুসিয়া।

'আমার একটা নাম দরকার, লা ব্লাংকা।'

'নামটা পেয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না জেনেও?'

'লাভ হবে কিনা আমাকে বুঝতে দাও।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে থাকলো লুসিয়া। তারপর জানতে চাইলো সে, 'নামটা না হয় পেলে, তারপর? আমি বেরোবো কিভাবে?'

'তোমাকে বেরোতে হবে না, সরকারী লোকেরা বের করে আনবে।'

'তারমানে কি আমাকে গ্রেফতার করা হবে?'

'কার্টেলের জন্যে গ্রেফতার হওয়া কোনো ব্যাপার? চোদ্দ শিক থেকে কিভাবে বেরোতে হয় তোমরা তা ভালো জানো।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো লুসিয়া। 'উত্তরটা যদি আমার জানা না থাকে?' অবশেষে ফিসফিস করে জানতে চাইলো সে।

'সেক্ষেত্রে,' মিথ্যে ভয় দেখালো রানা, 'চার্জগুলো আমি ফাটিয়ে

দিতে বাধ্য হবো।'

এবার লুসিয়ার নিঃশ্বাসের শব্দও পেলো না রানা। কোনো সন্দেহ নেই, ভয় পেয়েছে, অন্তত গলার আওয়াজ শুনে তাই মনে হলো। 'তুমি আসলে, আমার ধারণা, গাদ ইরেজকে খুঁজছো।'

'কে সে?'

'তাকে একজন ফাইন্যানসিয়ার বলা হয়।'

'ব্যাংকার?'

শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ভাবটা সামান্য হলেও ফিরে পেয়েছে লুসিয়া সানসেজ। 'হ্যাঁ,' বললো সে। 'তা বলতে পারো।'

'সে কি মেডিলিনে বাস করে?'

'আর সব ব্যাংকারদের মতো।'

'ধন্যবাদ,' বললো রানা, 'লা ব্লাংকা।'

'এনি টাইম,' বললো লুসিয়া। 'ধরে নাও ব্যবসার খাতিরে পরস্পরকে আমরা সাহায্য করলাম।'

'এরপর কি করতে হবে, মন দিয়ে শোনো,' বললো রানা। 'আমি মিথ্যে ভয় দেখাইনি, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোতে চেষ্টা করলে সত্যি তোমরা মারা পড়বে। যে যেখানে আছো, কেউ নড়াচড়া করো না। আধঘণ্টার মধ্যে ডি. এ. এস.-এর লোকজন, সাথে একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিয়ে, তোমাদের তেরোতলায় উঠবে। ফোন করে তাদেরকে ঠিকানাটা দিতে যাচ্ছি আমি। ঠিক আছে?'

কোনো জবাব না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলো লুসিয়া সানসেজ।

ডি. এ. এস. হেডকোয়ার্টারের নম্বরে ডায়াল করলো রানা, যোগাযোগ পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ শিউরে উঠলো। বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজটা চিনতে ভুল হয়নি ওর।

মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। গ্রেফতার এড়াবার জন্যে একা আত্মহত্যা করেনি লা ব্লাংকা, সহমরণে বাধ্য করেছে আরো তিনজনকে।

আট

'গাদ ইরেজ? তাঁর যে মর্যাদা বা স্ট্যাণ্ডার্ড, তিনি কোনো বাজে কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারেন না!' টেলিফোনে বললেন আলিজান আকরাম। 'আমি তাঁকে অত্যন্ত সম্মানী ব্যাংকার হিসেবে চিনি। তারচেয়ে বড় কথা, তিনি একজন ইহুদি।'

'সম্ভবত সরাসরি জড়িত নন,' বললো রানা। 'তবে জানেন নির্দেশটা কোত্থেকে দেয়া হয়েছে। তিনিও সমান দায়ী, আমি বলবো।'

'তোমার ধারণা, এই সুতো ধরে হের মুয়েলার পর্যন্ত যাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর আলিজান আকরাম বললেন, 'মুয়েলারদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পেয়েছি আমি। শহরের একজন ল-ইয়ারের সাথে কথা হয়েছে আমার, অনেক দিন ধরে চিনি তাকে। মুয়েলার পরিবারের কিছু কিছু কাজ করেছে সে। বিশেষ করে

ছেলেটা সম্পর্কেই বললো।'

'কি বললো?'

'তোমাকে মারার জন্যে বোমাটা যেদিন ফাটানো হলো, ওই একই দিনে ববি মুয়েলারের লাশ কলম্বিয়ায় পৌঁছায়,' বললেন আলিজান আকরাম। 'তাকে মাটি দেয়া হয় বাড়িতে। তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অনেক হলেও, পরিবারের বাইরে, খুব কম লোককেই উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া হয়। শহরের বাইরে থেকে প্রিস্টকে আনিয়ে কাজটা সারে ওরা।'

'ওরা বোধহয় রলফ মুয়েলার ও তাঁর এস্টেট-এর কাছাকাছি কাউকে ঘেঁষতে দিতে চায় না।'

'বোধহয়। আরো জানা গেছে, মাটি দেয়ার পরপরই গোটা পরিবার এস্টেট ত্যাগ করে। কেয়ারটেকার ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। ধারণা করা হচ্ছে, দেশের বাইরে চলে গেছে মুয়েলাররা। কথাটা কতোটুকু সত্যি আমি জানি না।'

এতো জানা কথা, ভাবলো রানা, মুয়েলার যদি মুলার হন, সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতাই অবলম্বন করবেন তিনি। 'তাহলে গাদ ইরেজ ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের হাতে আর কেউ নেই।'

রিসিভারে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। 'তুমি চাও, এ-ব্যাপারে আমি কিছু করি?'

'খুব উপকার হয় আপনি যদি তাঁর সাথে আমার একটা সাক্ষাৎ-কারের ব্যবস্থা করতে পারেন,' বললো রানা। 'আপনি তাঁকে ডাকলে তিনি কি আসবেন?'

'বোধহয়,' বললেন আলিজান আকরাম। 'আসার তো কথা।'

'কি হলো। আপনি তাহলে জানাবেন আমাকে।'

'ঠিক আছে,' বললেন বৃদ্ধ। 'বাড়িটা কেমন, তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'খুব ভালো, মিঃ আকরাম।'

'তোমার জন্যে আরো একটা বাড়ি ঠিক করে রেখেছি আমি,' জানালেন বৃদ্ধ। 'কাল থেকে ব্যবহার করতে পারবে। ইকুইপমেন্ট-গুলোও পেয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ, মিঃ আকরাম।'

'দে নাদা,' বললেন তিনি, যেন ব্যাপারটা সত্যি কিছু নয়।

'রানা, কোথায় তুমি?'

বন্ধু টমাস কালভিনকে আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসলেও, তাকে সেফ হাউসের ঠিকানা দিতে রাজি নয় রানা। 'সব ঠিক আছে, টমাস। মিশন সফল হয়েছে।'

'সে-কথা আমি জানতে চাইছি না,' বললো কালভিন। 'শালার রেডিওতে ব্যাপারটা প্রচার করা হয়েছে।'

'হোক।'

'কি ঘটেছে বলবে আমাকে?'

'আর কিছু জানতে চেয়ো না,' বললো রানা। 'তোমার জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

'বিপদ? আমার? রানা, ধরতে পারলে তোমাকে ওরা দু'বার ফাঁসি দেবে, তা জানো?'

'আমাকে ওরা ধরতে পারবে না, টমাস।'

'ফর গডস সেক, আমি পুলিশের কথা বলছি না। বলছি ক্রিমিন্যাল-দের কথা। নিঃসঙ্গ একজন বিদেশী, এ-দেশে যার কোনো সাপোর্ট নেই, অনায়াসে খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা।'

'হ্যাঁ, তা ফেলতে পারে।'

রানার উত্তর উপলব্ধি করার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো কালভিন। 'তারমানে বলছো, সে-কথা মনে রেখে গা-ঢাকা দেয়ার ব্যবস্থা তোমার করা আছে?'

এ-প্রশ্নেরও উত্তর দিতে চাইলো না রানা, ফোনে বেশিক্ষণ কথা বলারও ইচ্ছে নেই। কেউ ওদের কথা শুনছে কিনা, কি ধরনের ইকুইপমেণ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, কিছুই জানা নেই। 'আমি যোগাযোগ করবো, টমাস।'

'আমাকে তুমি সব জানাবে, রানা,' দাবির সুরে বললো কালভিন।

'অবশ্যই।'

পরদিন শনিবার, আলিজান আকরামের সাথে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দেখা করলো রানা। প্রতিষ্ঠানটার নাম মডার্ন ইলেকট্রনিক্স। অফিশিয়ালি অবসর নিলেও, তিনতলায় নিজের জন্যে একটা কামরা রেখেছেন আলিজান আকরাম, মাঝে মধ্যে এসে দেখে যান তাঁর লোকজন কিভাবে চালাচ্ছে ব্যবসাটা। ডেস্কের পিছনে বসে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

'কি বলেছেন তাঁকে, মিঃ আকরাম?' হ্যাণ্ডশেক করার পর বসলো রানা।

'খুব জরুরী একটা বিষয়ে আলাপ আছে,' অস্বাভাবিক ভারি গলায় বললেন বৃদ্ধ, ভাবটা যেন ঠিক এই সুরেই গাদ ইরেজকে কথাটা বলেছেন তিনি। 'ইনভেস্টমেণ্ট অ্যাডভাইজাররা হঠাৎ করে এ-ধরনের অনুরোধ পেতে অভ্যস্ত।'

'তাহলে কয়েক মিনিট তাঁর সাথে কথা বলতে পারবেন আপনি?'

'অনায়াসে।'

'টিনটো অফার করুন,' বললো রানা। 'পৌঁছুনোর সাথে সাথে।'

'এমনিতেও করবো।'

'কফির সাথে এই ট্যাবলেটটা খাইয়ে দেবেন।'

নীল পিলটা হাতের তালুতে নিয়ে দেখলেন আলিজান আকরাম। 'জিনিসটা কি?'

'আগে এটাকে মিকি বলা হতো,' জানালো রানা। 'তবে উপাদান-গুলো বদলে ফেলা হয়েছে। পঁয়তিরিশ মিলিগ্রাম ডাইয়াজেপাম থাকায় কোনো প্রতিক্রিয়া ছাড়াই সচেতনতা ফিরে আসবে তাঁর। সাধারণত ট্যাবলেটটা খেলে মনে খুব ফুর্তির ভাব আসে।'

'তারপর তুমি তাঁকে জেরা করবে?'

'হ্যাঁ।'

'কি প্রকাশ করলো, পরে মনে করতে পারবে না?'

'সেদিকটাও লক্ষ্য রাখবো আমি,' বললো রানা, দেখলো বৃদ্ধের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠছে। 'তাঁকে আঘাত করা হবে না।'

'কেন আমার খারাপ লাগবে বুঝতে পারছি না,' আলিজান আকরাম বললেন। 'তবে বোধহয় আমরা যে গেস্টাপো নই তা প্রমাণ করার জন্যে সবার সাথেই নরম ব্যবহার করা দরকার। আমি সব রকম নির্যাতনের বিরোধী।'

ড্রাগের প্রতিক্রিয়া শারীরিক নির্যাতনের সমতুল্যও হয়ে উঠতে পারে। রানা ভাবলো, কথাটা আলিজান আকরামকে জানানো বুদ্ধি-মানের কাজ হবে না। ড্রাগটা কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তা নির্ভর করে সাবজেক্টের শারীরিক ও মানসিক প্রতিরোধ শক্তির ওপর। লোকটা যদি ইন্টারোগেশন পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত হয়, সেই সাথে

যদি জীবন দিয়ে হলেও তথ্য ফাঁস না করার ব্যাপারে পণ করে থাকে, তাহলে তথ্য আদায়ের যে-কোনো চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, অন্তত দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত। 'ডাক্তার ভদ্রলোককেও খবর দিন, গাদ ইরেজের জ্ঞান ফিরে আসার সময় তিনি উপস্থিত থাকলে ভালো হয়। তিনি জানাতে পারবেন, আসলে শারীরিক কোনো কারণে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন ইরেজ। আপনার ডাক্তার কাজটা করবেন তো?'

'আমি যা বলবো তাই করবে সে,' বললেন আলিজান আকরাম। 'নাৎসীরা ওর গোটা পরিবারকে মেরে ফেলে।'

'তাকে আপনি কতোটুকু বলেছেন?'

'প্রায় কিছুই না। আমি অনুরোধ করায় সে কোনো প্রশ্ন তোলেনি।'

'তাহলে আর দেরি করার মানে হয় না, মিঃ আকরাম।'

পনেরো মিনিট পর আর্থিক পরামর্শ দেয়ার জন্যে উপস্থিত হলেন গাদ ইরেজ। পাশের কামরার জানালা থেকে তাঁকে অফিস বিল্ডিঙে ঢুকতে দেখলো রানা। চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হবে, অত্যন্ত দামী স্যুট পরে আছেন, মাথার মাঝখানে সিঁথিটা সরলরেখার মতো, চোখে বড় আকারের চশমাটা নাকের ওপর ঠিকমতো বসেনি। গাড়ি থেকে নেমে দৃঢ় পদক্ষেপে, শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে এলেন তিনি।

খালি অফিস বিল্ডিঙে একাই এসেছেন ভদ্রলোক। এখনো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, ড্রাগ ব্যবসার সাথে তিনি জড়িত কিনা। সাথে বডিগার্ড নেই, এতে হয়তো কিছুই প্রমাণ হয় না। তিনি জানেন, আলিজান আকরাম আইনের লোক নন।

তিন মিনিট পর আলিজান আকরামের অফিস কামরায় ঢুকে রানা দেখলো, গাদ ইরেজ জ্ঞান হারিয়েছেন। রানা আগেই অনুরোধ করে-

ছিল, লক্ষ্য রাখতে হবে কফিটুকু যেন ইরেজ চেয়ারে বসে পান করেন। কিন্তু নীল কার্পেটে তাঁকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে বোঝা গেল, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আলাপ করতে পছন্দ করেন। ডেস্কের সামনে একটা টেবিলে রয়েছে কাপটা, এখনো সেটায় যথেষ্ট টিনটো দেখলো রানা।

ভদ্রলোককে তুলে লম্বা একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিলো রানা। নাড়াচাড়া করায় তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো না। তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে, ইণ্টারোগেশন কিট থেকে সরঞ্জাম বের করে একটা ইঞ্জেকশন দিলো রানা। পাঁচ মিনিট পর আরেকটা। শেষেরটা ট্রুথ সেরাম বলা ঠিক হবে না, ওটার কাজ হালকা ঘুম আনা। একজন মানুষ যতোই অসচেতন পর্যায়ে যায়, সত্যি কথা বলার ঝোঁক ততোই বাড়ে। জ্ঞান ফিরে পাবার সময়টা কমবেশি করা যায় হিপনোসিসের সাহায্যে।

ওর উদ্বেগ একটাই, গলাটা ইরেজের অচেনা, স্প্যানিশ উচ্চারণে বিদেশী টানও থাকবে। ভদ্রলোক সাড়া না-ও দিতে পারেন। তবে সে-ধরনের কিছু ঘটলো না। গাদ ইরেজের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো রানা, তারপর সম্মোহন করে ঘুম পাড়িয়ে দিলো। সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না ভদ্রলোক।

সত্যিই তিনি অ্যাভেনিদা লাস ভেগাসের গাদ ইরেজ। মেডিলিন, কলম্বিয়ায় বাস করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম এলডা। দুই মেয়ে, এলমা আর সুমা, বয়স ষোলো আর বিশ। মেডিলিন ক্লাব ও ক্লাব দে প্রফেশন্যালস-এর সদস্য তিনি। পেশা, ইনভেস্টমেণ্ট কাউন্সিলর।

'ইনভেস্টমেণ্ট কাউন্সিলরের কাজটা কি?'

'মক্কেলের টাকা সবচেয়ে লাভজনক খাতে খাটানো,' এতো শান্ত ও নিচু গলায় বললেন ভদ্রলোক, ভান করছেন বলে মনে হলো না।

'এটাও এক ধরনের আর্ট?'

'হ্যাঁ।'

'আর আপনি তার মাস্টার?'

স্বপ্নের মধ্যে হাসলেন গাদ ইরেজ। 'আমি প্র্যাকটিস করি,' বললেন তিনি।

'একজনের টাকা আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেয়াও কি আপনার কাজের মধ্যে পড়ে?'

'পড়ে।'

'এ-ধরনের কোনো কাজ, বড় অঙ্কের, ইদানীং করেছেন?'

'অবশ্যই।'

'ঘুমোচ্ছেন আপনি, সিনর ইরেজ, ঘুমের মধ্যেই থাকুন। আমি চাই এ-ধরনের কাজগুলোর মধ্যে থেকে একটা কাজের কথা বিশেষ-ভাবে স্মরণ করুন আপনি। ঘটনাটা ঘটেছে প্রায় তিন হপ্তা আগে, দু'একদিন কম হতে পারে। কাজটা ছিলো, লুসিয়া সানসেজকে আড়াই লাখ মার্কিন ডলার ডেলিভারি দেয়ার। কাজটার সমস্ত খুঁটি-নাটি আপনাকে মনে করতে হবে।'

'না,' গাদ ইরেজ বললেন।

'মনে করতে পারছেন না?'

'অঙ্কটা আড়াই লাখ ডলার ছিলো না,' উদ্বেগের সাথে বললেন ইরেজ। 'ওটা হবে সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

হ্যাঁ, তাই তো হবার কথা। খরচ আছে লুসিয়া সানসেজের, মরিস-কে দেয়ার পর নিজের লাভটাও রাখতে হয়েছে। 'এই টাকা কি নগদ ডেলিভারি দেয়া হয়েছে?'

'আমার হাত দিয়ে নয়,' বললেন ইরেজ। 'তবে নগদই।'

'টাকাটা কার কাছ থেকে এলো ?'

এই প্রথম ভদ্রলোকের চেহারায় ইতস্তত একটা ভাব লক্ষ্য করলো রানা। বার কয়েক কোঁচকালো ভুরু জোড়া। 'ব্যাপারটা গোপনীয়, সিনর।'

'কিন্তু আপনাকে সাহায্য করার জন্যেই লেনদেনটা সম্পর্কে সব কথা জানতে হবে আমার। প্লিজ, সিনর ইরেজ। ঘটনার সাথে জড়িত সমস্ত চিন্তা আর অনুভব আরেকবার স্মরণ করুন।'

'আপনার জন্যে কি তা গুরুত্বপূর্ণ ?'

'হ্যাঁ,' আন্তরিকতার সাথে বললো রানা।

রানার অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক। 'সাধারণ একটা লেনদেন ছিলো ব্যাপারটা। সিটাডেল অ্যাকাউন্ট থেকে মিস লুসিয়াকে দেয়া হয় টাকাটা।'

'বুঝলাম,' বললো রানা। 'সিটাডেল অ্যাকাউন্ট অত্যন্ত সেনসি-টিভ।'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাকাউন্টটার প্রিন্সিপ্যাল কে ?'

উত্তরটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগলেন ইরেজ, এক মুহূর্ত পর বললেন, 'গাতেলা আর রুনা লজেন।'

'এরা তো আসলে ভিক্টর লজেনের মা ও বাবা, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাকাউন্টটা কি তাঁরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেন ?'

গাদ ইরেজ মৃদু হাসলেন। 'আমার তা মনে হয় না।'

'তাহলে অন্য কোনো উৎস থেকে নির্দেশ ইত্যাদি আসে।'

'বেশিরভাগ সময়।'

'কে দেয় নির্দেশগুলো?'

'আজকাল ভিক্টর লজেন।'

আর কিছু জানার দরকার নেই রানার।

নয়

'এখনো ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে,' বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে বললেন আলিজান আকরাম। 'একজন ইহুদি, হতে পারে ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো দুর্বলতা নেই, লজেনের মতো একজন ফ্যাসিস্টের সাথে কেন হাত মেলাবেন?'

'টাকার জন্যে,' বললো রানা।

'ইরেজরা রীতিমতো ধনী পরিবার,' বললেন বৃদ্ধ। 'এই শহরে আমি আসার পর থেকেই দেখছি প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করছে ওরা।'

'অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে,' বললো রানা। 'আপনি চান, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করি?'

রানার অনুরোধে গাদ ইরেজকে ডেকেছেন বটে, কিন্তু শুরু থেকেই অস্বস্তি বোধ করছেন আলিজান আকরাম। আগেই উপলব্ধি করেছেন, রানার চাপিয়ে দেয়া ভূমিকাটা তাঁকে ঠিক মানায় না। ব্যাপারটা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করার ইচ্ছে তাঁর না থাকলেও, কৌতূহল চেপে রাখতে

পারলেন না। 'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'এটা আমাকে জানতে হবে।'

গাদ ইরেজের সাথে এরইমধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে রানার, কাজেই তার সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া খানিকটা সহজ হলো। ইন্সিয়োরেন্সের কাছে ফিরে এলো রানা, এখনো সেখানে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন ভদ্রলোক। রানা বললো, তাঁর অর্থনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ পেতে হবে ওকে।

'বুঝতে পারছি আপনাকে আমার সাহায্য করা দরকার,' বললেন ইরেজ, যেন অপরাধবোধে ভুগছেন, সেই সাথে অবহেলার শিকার। 'হিসেবটা এবার মেলাতে হয়।'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'কিন্তু তার আগে ঘটনার কারণগুলো জানতে হবে আমার। আপনার মতো একজন ভদ্রলোক ভিক্টর লজেনের সাথে হাত মিলিয়েছেন বা তার নির্দেশ মতো কাজ করছেন, এটা বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন। আপনি, একজন ইহুদি।'

'ধর্ম না মানলে সে আবার ইহুদি কিসের।'

'কিন্তু আপনি ইহুদি পরিবারের সন্তান।'

'হ্যাঁ।'

'ফ্যাসিস্টরা গরু-ছাগলের মতো হত্যা করেছে ইহুদিদের, সুযোগ পেলে আজও করবে, এ-কথা জেনেও আপনি তাদের দলে নাম লেখালেন?'

কাতরকণ্ঠে ইরেজ বললেন, 'আমার কোনো উপায় ছিলো না।'

'ঠিক কি বলতে চান?'

'ওদের সব কথা শুনতে হবে আমার। তা না হলে আমাদের পরিবারের সম্মান বলে কিছু থাকবে না।'

'ব্যাখ্যা করুন। কি জন্যে তারা আপনাকে হুমকি দিয়েছে?'

'আমি নই,' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ইরেজ, যেন ড্রাগের প্রতিক্রিয়া ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। 'আমাদের জন্যে অসম্মান কিনে আনেন আমার বাবা। অনেক বছর আগের কথা, ইউরোপে তাকে একটা মিশনে পাঠানো হয়। সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওঅর চলছে তখন। কলম্বিয়ার ইহুদিরা মোটা টাকা চাঁদা তুলেছিল, নাৎসীদের কাছ থেকে জার্মান ইহুদিদের ছাড়িয়ে আনার জন্যে। বিশ্বাস করে টাকাটা আমার বাবার হাতে তুলে দেয়া হয়। বিশ্বাসের মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করেননি তিনি। এসএস-কে তিনি টাকা দেন, বিনিময়ে কিছু ইহুদিকে মুক্ত করে আনেন। কিন্তু আরো অনেক টাকা তাঁর কাছে রয়ে যায়, সেগুলো তিনি নিজের কাছে রেখে দেন।'

'আচ্ছা। আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি,' বললো রানা। 'কিন্তু আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করার হুমকিটা কে দিলো?'

'ভিক্টর,' ইরেজ বললেন। 'সে জানে।'

ব্যস, এটুকুই; এর বেশি কিছু ইরেজ জানেন না বা জানাতে চান না। এ-ধরনের একটা তথ্য ভিক্টর লজেন কিভাবে সংগ্রহ করতে পারলো তা তিনি ব্যাখ্যা করলেন না। ব্ল্যাকমেইলিঙের ভয়ে মাঝে মধ্যে তাঁকে এমন সব কাজ করতে হয় যা আইনসিদ্ধ নয়।

উদ্ধার করা তথ্যটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলিজান আকরামের সাথে আলাপ করলো রানা। টাকাটা পেয়েছিল এসএস, কাজেই অঙ্কটা তারা জানতো, জানতো কার কাছ থেকে টাকাটা এলো, কতোজন ইহুদির মুক্তির বিনিময়ে। সে-সময় হেনেরিক মুলার ছিলেন গেস্টাপো প্রধান, সেই সাথে এসএস গ্রুপেনফুয়েরার, বা জেনারেল। ক্যাম্পের গেট দিয়ে লাশগুলো বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বন্দী সমস্ত ইহুদি তাঁর মাথাব্যথা ছিলো। মুলার ছিলেন আইথম্যানের ইমিডিয়েট বস্ ও উপ-

দেশ। । ওঁওদিদের মুক্তির বিনিময়ে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা আর কেউ জানুক বা না জানুক, মুলার নিশ্চয়ই জানতেন। তথ্যগুলো তিনি তাঁর ভায়রার ছেলে ভিক্টর লজেনকে জানিয়ে দিলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

যে যোগাযোগটা খুঁজে পেতে চাইছে রানা, সেটা যদি এই মুহূর্তে প্রমাণ করা না-ও যায়, অন্তত পাওয়া গেছে। ভিক্টর লজেন তথ্যটা জানে, তথ্যের উৎস হলো গেস্টাপো মুলার।

তিন কি চারদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখে ইরেজকে কথা বলাতে পারলে মন্দ হতো না, কোকেন সম্রাটদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসতো। কিন্তু জানাজানি হয়ে যাবার ঝুঁকিটা বিরাট। ইরেজ এক ঘণ্টার বেশি অজ্ঞান না থাকলে আলিজান আকরাম সামান্য ঝুঁকি নিয়ে গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

ঘুমের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে সব ভুলে যাবার সাজেশন দিয়ে ইরেজকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিলো রানা, তারপর ডাক্তারের হাতে তুলে দিলো তাঁকে। মডার্ন ইলেট্রকনিক্স থেকে বিদায় নেয়ার আগে রেকর্ডার থেকে টেপটা খুলে নিলো ও, ফোন করে কালভিনের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করলো।

কালভিনকে দ্বিতীয় সেফ হাউসের ঠিকানা দিলো রানা, অনুরোধ করলো সে যেন ভিক্টর লজেনের ফাইলটা সাথে করে নিয়ে আসে। স্পর্শকাতর তথ্য হস্তান্তরে মোটেও উৎসাহী নয় কালভিন, তবে বিনিময়ে কি পাবে জানার পর আর প্রতিবাদ করলো না। গাদ ইরেজ তার কাছে অত্যন্ত অর্থবহ একটা নাম।

লেটেস্ট মডেলের একটা প্লাই মাউথ চালাচ্ছে রানা। শহরের এক পাশে, আলমসেনট্রো শপিং সেন্টারের কাছাকাছি বাড়িটা। আশপাশে অনেকগুলো রঙ করা কটেজ আছে, চারধারে বাগান নিয়ে। কালভি-

নের ধারণা, এ-ধরনের অভিজাত এলাকায় রানাকে শুধু যে মানায় তা-ই নয়, ওর সামর্থ্যের মধ্যেও পড়ে।

'রানা এজেন্সির ডিরেক্টর, তোমার কথাই আলাদা!' সেফ হাউসের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সে। 'কিন্তু, দোস্ত, যতোই পোজ-পাজ দেখাও, ভিক্টর লজেনকে ডিনারের দাওয়াত দিয়ে আনতে হলে আরো অনেক ওপরে উঠতে হবে তোমাকে।'

'দাওয়াত দিতে হবে না, ভিক্টর নিজেই আমার কাছে আসবে,' বললো রানা। 'হামাগুড়ি দিয়ে।'

হেসে উঠলো কালভিন, কিন্তু বাড়ির ভেতরটা দেখে হাসি তো থামলোই, হঠাৎ থামায় আরেকটু হলে বিষম খেতে যাচ্ছিলো। লিভিং-রুমে দুনিয়ার ইকুইপমেন্ট জড়ো করা হয়েছে—টেপ রেকর্ডার, কম-পিউটার টার্মিন্যাল, প্রিন্টার, মোডেম ও সফটঅয়্যার, রিসার্চ আর. ও. এম., তিনটে ফোনলাইন, রেডিও ট্রান্সসিভার, ভয়েস সিমিউলেটর, আরো কতো কি। চারদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো কালভিন। 'তোমার কাজের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমি তোমাকে ঈর্ষা করি।'

আলিজান আকরাম ওর অনুরোধ রক্ষা করেছেন, যদিও ইকুইপ-মেন্টগুলো লেটেস্ট মডেলের নয়। আজ সকালে ওগুলো পরীক্ষা করেছে রানা, কাজ চালাতে কোনো অসুবিধে হবে না। 'এই নাও টেপটা, টমাস। হারিয়ো না, বা এখুনি হাতছাড়া করো না।'

টেপটা নিয়ে সাথে সাথে ঋণ পরিশোধ করলো কালভিন। বললো, 'এটা একটা ডিস্ক কপি। এবার বলো দেখি, গাদ ইয়েজকে তুমি কথা বলাবে কিভাবে?'

'নারকো-হিপনোসিস।'

'নারকো-হিপনোসিস?' মুখ বাঁকালো কালভিন। 'বাপের কালেও

শুনিনি। কি জানবো আমি?'

'যা জানো তারচেয়ে বেশি।'

'দেখা যাক।'

টেপ রেকর্ডারের সামনে বসলো কালভিন, কানে এয়ারফোন তুললো। আলিজান আকরামের কমপিউটারে একটা সফটঅয়্যার সংযোগ দিলো রানা।

একটা মাইক্রো ডিস্কের পুরোটা জুড়ে রয়েছে ভিক্টর লজেন, ছাপলে সেটা আড়াইশো পৃষ্ঠার একটা জীবনী গ্রন্থ হয়ে যাবে।

মেডিলিন, কলম্বিয়ায় উনিশ শো আটচল্লিশে জন্মেছে ভিক্টর লজেন। সাঁতেলা আর রুনা (ডেল) লজেনের ছেলে সে। একটু বড় হতেই বাড়ি থেকে দূরে শিক্ষালাভের জন্যে পাঠানো হয় ভিক্টরকে। বুয়েনস আয়ার্সের সেন্ট জর্জেস স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করে, পরে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে। সম্ভবত টাকার জোরে একটা মার্কিন সামরিক স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ হয় তার। কি কারণে জানা যায়নি, কোর্স শেষ না করেই স্কুল ছেড়ে দেয় সে।

পরবর্তী দুই কি তিন বছরের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সময়টা তার লস অ্যাঞ্জেলসে কাটে, জিম মরিসন আর ডোর নামে খ্যাত রক গ্রুপের অন্ধ ভক্তে পরিণত হয় সে। অন্তত তিন বছর আগে নিজের পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তাই বলেছে সে। জিম মরিসনের গান নাকি তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সিরিয়াস ভিক্টর, কিন্তু পাগলাটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে তার। আরিজোনা ইউভার্সিটিতে তিন বছর ছিলো, সাথে ড্রাগ রাখার জন্যে তখনই একবার গ্রেফতার হয় সে। সরকারী মহলে ধরাধরি করায় জেল হয়নি। বিচার হয়,

অভিযোগ প্রমাণিত হয়, রায় হয় বহিষ্কারের।

ষাট দশকে তোলা ছাত্র ভিক্টর লজেনের ফটোয় দেখা গেল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, পরনে লেদার ট্রাউজার আর লেদার জ্যাকেট। লম্বা চুল আর লেদার এখনো তার অত্যন্ত প্রিয়। তখনো সে ড্রাগ বিক্রি করতো, এখনো করে। চেহারায় জেদ আর মারমুখো ভাবটা একটুও বদলায়নি।

ভিক্টর লজেনের মাদকাসক্তি সম্পর্কে ডি. ই. এ. সম্প্রতি কয়েকটা রিপোর্ট তৈরি করেছে। একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেডিলিনের উত্তরে একবার একটা কোকেন ল্যাবে উপস্থিত হলো ভিক্টর, শোল্ডার স্ট্র্যাপে কেজি-নাইন ছাড়া পরনে আর কিছু ছিলো না। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে খুন করার সম্ভাবনা নিয়ে সহকর্মীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করে সে।

নিজের একটা রেডিও স্টেশন আছে ভিক্টরের, সেখান থেকে প্রায়ই তার সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। ডি. ই. এ.-র রিপোর্ট, সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় একটা মঞ্চে থাকে সে, দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয় সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে। এতে করে নাকি দর্শক ও শ্রোতাদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করা সহজ হয়।

জিম মরিসন আর ডোর নিয়ে যতো পাগলামিই করুক, ব্যবসা বুদ্ধি কখনো হারায়নি সে। তার কোকেন সাম্রাজ্য বিশাল আকৃতি পেতে থাকে। উপদেষ্টা আর সহযোগী হিসেবে বাবাকে পায় ভিক্টর, ল্যাটিন আমেরিকার কোকেন সাপ্লাই আর বিলিবণ্টন ব্যবস্থায় এক-চেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে সে।

সত্তর দশকের শেষ দিকেও কোকেন ব্যবসা জমে ওঠেনি। বলিভিয়া থেকে ক্যারিবিয়ান পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো উৎসগুলো। কাঁচা মাল

থেকে শুরু করে পরিশোধিত মিহি পাউডার পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে মধ্যসত্ত্বভোগীরা ছোঁ দিয়ে নিয়ে যেতো মোটা টাকা। সরাসরি ক্রেতার কাছে কোকেন পৌঁছে দেয়ার ধারণাটা ভিক্টরই প্রথম ব্যবসায়ী মহলে জনপ্রিয় করে তোলে।

ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করলো ভিক্টর, তাদেরকে কোকেন চাষ করতে উৎসাহ যোগালো। তারপর চাষীদের বাড়ির কাছাকাছি প্রসেসিং ল্যাবরেটরী বসালো—কলম্বিয়া, বলিভিয়া, পেরু আর ব্রাজিলে। খেতের পাশে বসেই কোকা পাতা থেকে কোকা পেস্ট তৈরি করলো সে, বহনযোগ্য ল্যাব-এর সাহায্যে সেটাকে আরো পরিশোধিত করে মহামূল্যবান কোকেন ক্রিস্টালে রূপান্তরিত করলো।

ইণ্ডিয়ানদের শ্রম সস্তা। কেমিস্টদের বেতন খুব বেশি, কিন্তু সংখ্যায় তারা কম। দশ মিলিয়ন ডলার পুঁজি খাটিয়ে ভিক্টর লক্ষেন ঘরে তুললো একশো মিলিয়ন। ডি. ই. এ.-র এটা খসড়া হিসাব, প্রথম এক বছরের। সত্যিকার লাভ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।

কোকেন ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ ওই আমেরিকাতেই বিপুল ক্রেতা রয়েছে। শতো বছর, এমন কি সম্ভবত হাজার বছর ধরে দক্ষিণ আমেরিকার লোকজন কোকা পাতা চিবাচ্ছে। এ-ধরনের ব্যবহার থেকে নেশা খুব সামান্যই হয়। কোকা ঝোপ তৈরি করতে খুব একটা পরিশ্রম নেই, পাতাগুলো বিক্রিও হতো সস্তায়। কিন্তু প্রসেসিং করার পর জিনিসটার গুণগত পরিবর্তন হলো বৈপ্লবিক, সেই সাথে বেড়ে গেল দাম। পরিশোধিত কোকেন ছড়িয়ে পড়লো সারা দুনিয়ায়, এমন কি তৃতীয় বিশ্বের হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকরাও এক পুরিয়া কোকেন কেনার টাকার জন্যে শুরু করে দিলো ছিনতাই আর রাহাজানি।

প্রথম দিকে কলম্বিয়ানরা যুক্তরাষ্ট্রে যারই নেটওঅর্ক আছে তার কাছেই কোকেন বিক্রি করতো। মায়ামিতে কিউবানদের কাছে, নিউ-ইয়র্কে মাফিয়ার কাছে। কিছুদিন পর তারা উপলব্ধি করলো, এতে করে নিজেদের তারা বঞ্চিত করছে। যার নেটওঅর্ক আছে, আসল লাভটা তার পকেটে চলে যাচ্ছে। একটা প্যাকেট একশো ডলারে কিনে হাজার বা দু'হাজার ডলারে বিক্রি করছে তারা। ইতিমধ্যে মেইন স্ট্রীটে কোকেনের রমরমা বাজার তৈরি হয়েছে, ওখানে ক্রেতার সংখ্যা এতো বেশি যে লাভের অঙ্ক সম্পর্কে আগাম কিছু বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি করার জন্যে কোকেন নিয়ে মেইন স্ট্রীট, দক্ষিণ ফ্লোরিডায় হাজির হলো ভিক্টর লজেন। ওখানকার কিউ-বান ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে ব্যবসা করে, ড্রাগ ব্যবসার কলা কৌশল তারাই কলম্বিয়ানদের শিখিয়েছে। বেশি লাভের লোভে শিক্ষানবীশরা এবার হয়ে উঠলো তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ; শুধু সরবরাহ নয়, বিলি-বণ্টনও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলো তারা। কার্টেলের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে লজেন ও কয়েকজন ব্যবসায়ী আততায়ীর একটা ছোটো দলকে পাঠালো ফ্লোরিডায়।

আশির দশকের শুরুতে এভাবেই বেধে গেল ড্যাড কাউন্টি কোকেন ওঅর। তিন বছর স্থায়ী হলো যুদ্ধটা। কলম্বিয়ানরা খুন করলো কিউবানদের, খুন করলো মাফিয়াদের, খুন করলো স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের, তারপর আর কাউকে না পেয়ে নিজেদের মধ্যে শুরু করলো খুনোখুনি। তাৎক্ষণিক কিংবদন্তীর জন্ম হলো—টার্নপাইক শ্যুটআউট, ড্যাডল্যাণ্ড মল ম্যাসাকার। মারপিট আর খুন-খারাবি ছড়িয়ে পড়লো নগর জীবনের সর্বত্র। লাশ সংগ্রহের জন্যে ড্যাড কাউন্টির মর্গ কর্তৃপক্ষকে

একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেইলর ভাড়া করতে হলো। সংশ্লিষ্ট মহলের হিসাবে শান্তি নামার আগে খুন হয়ে গেল তিনশোর বেশি লোক।

রক্তপাত বন্ধ হবার পর শেয়ার ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনায় বসলো ব্যবসায়ীরা। যা আশা করেছিল নিজের ভাগে তাই পেলো ভিক্টর লজেন। কলম্বিয়ার একটা এয়ারলাইন কিনলো সে, ব্রাঞ্চ থাকলো মায়ামিতে। কোকেনের বিপুল চাহিদা পূরণ করার জন্যে নিজের বিমান বহর খুবই উপকারে লাগলো তার। ফ্লোরিডা রাজ্যের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটা কিনে নিলো, সাবেক মালিককে দায়িত্ব দিলো কোকেন গুদামজাত করার। বাহামার একটা দ্বীপও কিনলো ভিক্টর, বড় ধরনের কোকেনের চালান যাতে জাহাজযোগে চুপিসারে পাচার করা যায়।

খুন করার দরকার নেই এমন সব লোককে ইতিমধ্যে কিনে নিয়েছে ভিক্টর। দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করায় কালচারের তাৎপর্য আর মূল্য সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়েছে সে : বড় হবার পর আমরা টাকাকে পুজো করি। এক এক করে ল-ইয়ার, রাজনীতিক, পুলিশ আর ব্যাংকারদের কিনে নিলো সে।

ভিক্টর লজেনের ফাইলে জিম মরিসনের মৃত্যু সম্পর্কেও একটা রিপোর্ট আছে। প্যারিসের এক হোটেলে নিজের বমিতে মুখ ঘষতে ঘষতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লোকটা। তার এই মৃত্যু রহস্যজনক। কিছুদিন আগে হোটেলটা কিনেছিল ভিক্টর। যে-কামরায় পা পিছলে আছাড় খায় মরিসন, সেটা নাকি ভিক্টরের পরামর্শ অনুসারে নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল। যদিও মরিসনের মৃত্যুর জন্যে তাকে দায়ী করার মতো কোনো তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

মেডিলিন শহরের শেষ প্রান্তে থীম পার্ক তৈরি করেছে ভিক্টর। পার্কের সামনের গেটে সে তার আদর্শ জিম মরিসনের একটা বিশাল

মূর্তি বানিয়েছে। ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি, জিম মরিসন চিৎকার করছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

রানা উপলব্ধি করলো, ভিক্টর লজেনকে শুধু উন্মাদ একটা খুনি বলে মনে করলে ভুল হবে। লোকটা এক ধরনের প্রতিভা। সংশ্লিষ্ট মহলের রাঘব-বোয়ালরা বিশ বছর ধরে বলে আসছিল, কাজটা সম্ভব; কিন্তু অল্প যে-ক'জন কাজটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করে তারা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়। ভিক্টর সফল হলো প্রথমবারই, নিজের জন্যে গড়ে তুললো বিরাট কোকেন সাম্রাজ্য, কোকেন সম্রাট উপাধি নিয়ে আরোহণ করলো সিংহাসনে।

অবশ্য প্রথম থেকেই কিছু সুবিধে পেয়েছে ভিক্টর। নিজের বাবাই তার শিক্ষাগুরু।

সাঁতেলা লজেন কিশোর বয়স থেকেই ড্রাগ বেচতো। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও তার ব্যবসার তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কারণ মার্সেইলেসের আর সব আণ্ডারগ্রাউণ্ড লিডারদের মতো সে-ও জার্মান দখলদারদের পুরোপুরি সাহায্য করেছে। রেজিস্ট্যান্স সদস্যদের খুঁজে বের করে হেনেরিক মুলারের গেস্টাপোর হাতে তুলে দিতো তারা।

'ল অভ ফিফটি'-র কারণে সাঁতেলা লজেনের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। ফরাসী এই আইনটায় বলা হয়েছে, দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে সমস্ত রেকর্ড-পত্র যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভে আগামী পঞ্চাশ বছর চাপা থাকবে। তবে উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের জুন মাসে মিত্রশক্তি আক্রমণ করলে মার্সেইলেস ছেড়ে পালিয়ে যায় সাঁতেলা। শহরটায় আর কখনো ফেরেনি সে।

জার্মান সৈন্যরা পিছু হটছিল, অনেকের ধারণা তাদের সাথে ভিড়ে যায় সাঁতেলা। কারো কারো রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কর্সিকায় চলে যায় সে, কিংবা আরো দূরে—রোমে। সঠিক খবর পাওয়া গেল একজন ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসারের রিপোর্ট থেকে, যুদ্ধ শেষ হবার পর আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সে দেখা গেছে তাকে।

ওখানে একটা সাপার ক্লাব চালাচ্ছিল সাঁতেলা, পালিয়ে আসা ফ্যাসিস্টরা তার নিয়মিত খদ্দের। কিছুদিনের মধ্যে মার্সেইলেসে রয়ে যাওয়া পুরনো বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করলো সে, সেই সাথে তার উদ্যোগে আটলান্টিক পাড়ি দিতে শুরু করলো হেরোইন।

তখনো ল্যাটিন আমেরিকার ড্রাগ ব্যবসা জমে ওঠেনি। বিশৃংখলা ছিলো চরম। শক্তি অর্জন করে অজেয় হয়ে ওঠার মতো কোনো দলও ছিলো না। কর্সিকান ঐতিহ্য নিয়ে মার্সেইলেসের গ্যাংলিডাররা এই সুযোগটা গ্রহণ করলো। ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করলো তারা, হুকুম দিলো প্রয়োজনে খুন করার। কাজ হলো জাদুর মতো, নিয়ম আর শৃংখলার মুখ দেখলো ড্রাগ ব্যবসায়ীরা। সাঁতেলা লজেন নতুন হলেও, চেইন-এর শক্ত লিঙ্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো নিজেকে, যে চেইনটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে বহু দেশে চলে গেছে, চলে গেছে সীমান্ত ছাড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত।

তবে ড্রাগ চোরাচালানে সব সময় সাফল্য আসেনি। কিছুদিনের মধ্যেই ফরাসী নারকোটিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে দলাদলি শুরু হলো। জুয়ান পেরনের ফ্যাসিস্ট সরকার ড্রাগ ব্যবসা একটা পর্যায় পর্যন্ত সহ্য করলো, কারণ ব্যবসাটা থেকে হু-হু করে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে। কিন্তু ব্যাপক গোলাগুলি শুরু হতে পেরনবাদীদের টনক নড়লো।

এলাকার ভাগ নিয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো

সাঁতেলা। নিজের নাইটক্লাব কাফেতে বসে আছে সে, একদল লোক ভিতরে ঢুকে গুলিবর্ষণ শুরু করল। .৩৮ ক্যালিবার ব্যবহারা করলো তারা, গুলি খেল সাঁতেলাসহ আরও বেশ কয়েকজন। বড় বড় হেডিঙে খবরটা ছাপা হল পত্রিকায়, সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেল সাঁতেলা নাইটক্লাব।

তবে ইস্পাতের জ্যাকেট পড়ানো বুলেট সাঁতেলাকে মারার জন্য যথেষ্ট নয়। বেঁচে গেল সে, সময়মত আবার ব্যবসাতেও ফিরে এলো। একদিন প্রতিদ্বন্দী দলের নেতাকে ধরে আনলো তার লোকজন, এই নেতাই তাকে খুন করার হুকুম দিয়েছিল। ধীরে ধীরে, কয়েক ঘন্টা সময় নিয়ে, খুন করা হল লোকটিকে। বলা হয়, তার শারীরিক যন্ত্রণার ছবি তোলে সাঁতেলা, তারপর সেটা মার্সেইলেসে তার সমর্থকদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কথাটা সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ ক'দিন পর একটা স্টিল ফটোগ্রাফ স্থানীয় দৈনিকে ছাপা হয়। যে লোকের লাশই পাওয়া যায়নি, তার ফটো কোত্থেকে আসে? এর কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।

ফাইলের এই ঘটনাটা পড়ে অস্বস্তিবোধ করল রানা। আচরণটায় যেন হেনরিক মুলারের ছাপ মারা রয়েছে। ঠিক এ ধরণের আচরণ অ্যাডমিলার ক্যানারিস-এর সাথেও করেছেন মুলার। ক্যানারিস ছিলেন জার্মানি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ, মুলারের একজন প্রতিদ্বন্দী। হিটলারের সাঙ্গপাঙ্গদের খুশি করার জন্য দীর্ঘ, যন্ত্রণাকর ইন্টারোগেশনের পুরোটা মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন মুলার। নাৎসি এলিটদের জন্য এধরণের কাজ আরো তিনি করেছেন, একজন বন্ধুর জন্য আরেকবার করে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

হাসপাতালে সেরে উঠছে সাঁতেলা, কেবিনে তার সাথে আরও একজন লোক রয়েছে। ঘটনাচক্রে গুলি খেয়েছে লোকটা, নাম ভিক্টর ডেল। পা হারাবার জন্য সুদর্শন সাঁতেলাকে দায়ী না করে তার বন্ধুতে পরিণত হল ভিক্টর ডেল।

একজন কলম্বিয়ান অ্যামব্যাসাডরের ছেলে ডেল, বাপের সাথে আর্জেন্টিনায় বসবাস করছে। ফুর্তিবাজ ছেলে, জাজ ভালবাসে, ড্রাগে আপত্তি নেই, পছন্দ করে ফ্যাসিস্ট পলিটিক্স। তার এক বোন আছে, রুনা ডেল, আহত ভাইকে দেখতে প্রায়ই হাসপাতালে আসে। এই সুত্রেই সাঁতেলা লজেনের সাথে রুনা ডেলের পরিচয়।

রুনার বাবা মারা যাবার পরদিন বিয়ে করলো ওরা, পরিচয় হবার ছ'মাস পর। বিয়ের আগেই রুনার পেটে বাচ্চা আসে, যে বাচ্চাটি প্রকৃতির একটি মারাত্মক ভুল হিসেবে প্রতিপন্ন হবে ভবিষ্যতে। জন্ম নিল বাচ্চা, নাম রাখা হল ভিক্তর লজেন। একবছরের মধ্যে রুনার দেশ কলম্বিয়ায় চলে এল পরিবার টি। বাবার জমিদারীর বিরাট একটা অংশ পেয়ে গেল রুনা লজেন।

স্ত্রীর সাথে কলম্বিয়ার চলে আশার পিছনে বড় একটা উদ্দেশ্য ছিল সাঁতেলার। আর্জেন্টিনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াল সে, তার মানে এই নয় যে ব্যবসা থেকে অবসর নিল।

খুব বেশিদিন লাগল না, সংশ্লিষ্ট মহল লক্ষ্য করলো, হটাৎ করে কোকেনের সরবরাহ দারুনভাবে বেড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? কোত্থেকে আসছে এত কোকেন? খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, নতুন উৎসটা হল আপার কাউকা ভ্যালি। সন্দেহ নেই, ওদিকে কেউ নিজের উদ্যোগে কোকা পাতা চাষ করছে। শুধু তাই নয়, নিজের প্রসেসিং প্ল্যান্ট আছে তার। পরিশোধিত কোকেন স্থানীয় বাজারে, সেই সাথে

পশ্চিম গোলার্ধে ছড়িয়ে দিচ্ছে সে।

ব্যবসায় ফিরে এলো সাঁতেলা। ছেলের জন্যে তৈরি করে দিলো সাম্রাজ্য বিস্তারের ভিত। প্রায়ই তাকে বলতে শোনা গেছে, কলম্বিয়ায় তার বসবাস করার কারণ হলো : এটাই ল্যাটিন আমেরিকায় একমাত্র দেশ যেখান থেকে ছুটো সমুদ্রের নাগাল পাওয়া যায়। দেশটা ছুর্গম পর্বতসংকুল, সেই সাথে সরকারী অফিসাররা লোভী ঘুষখোর, এক-জন স্মাগলারের স্বর্গরাজ্য হতে কোনো বাধা নেই।

কলম্বিয়ায় যখন লা ভায়োলেনসিয়া তুঙ্গে, ফ্যাসিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমর্থকদের নিয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠলো সাঁতেলা। পরে তার ছেলে ভিক্টর লজেন এদেরকে নিয়েই প্রতিষ্ঠিত করলো নিজের রাজনৈতিক পার্টি, হোয়াইট গামা।

ঘুষ দিয়ে ছেলের জন্যে আরো একটা কাজ করলো সাঁতেলা। সর-কারী এয়ারলাইন অ্যাভিয়ানকার গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের লোকদের বসালো সে। টিকেট আর নিরাপত্তা বিভাগের প্রধানরা জানলো, তারা যদি চোখ বুজে থাকে তাহলে রাতারাতি কোটিপতি হতে পারে। আর যদি চোখ খোলা রাখে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে চায়, লাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

রাজনীতিকদের কেনা গেল আরো সহজে। নির্বাচন অভিযান পরি-চালনার জন্যে টাকা দরকার তাদের। জনসাধারণের কাছ থেকে খুব একটা চাঁদা পাওয়া যায় না, কাজেই অভাবটা পূরণ করা হলো নারকো-ডলার দিয়ে। নির্বাচিত হবার পর কোকেন সম্রাটকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে উপায় থাকলো না তাদের। পেশাদার খুনিদের হাতে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি তারা নিতে পারে না।

তারপরও অবশ্য টাকা খেতে রাজি নয় এমন লোকের সংখ্যা কম

নয়। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতাই তার প্রমাণ। ডজন ডজন বিচারককে খুন করা হলো, মেডিলিনের দু'জন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও রেহাই দেয়া হলো না। উনিশশো চুরাশি সালে মোটরসাইকেল আরোহী ককেরসদের হাতে প্রাণ হারালেন আইন মন্ত্রী। যে-কোনো জাতীয় দৈনিকের মালিক তাঁর পত্রিকায় ড্রাগ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কিছু লিখলে ধরে নিতে হবে তিনি তাঁর মৃত্যু ডেকে এনেছেন!

এরপর ভিক্টর লজেনের নেতৃত্বে হোয়াইট গামা কলম্বিয়ার রাজনীতিতে তৎপর হয়ে উঠলো। সবাই জানলো, নির্বাচনে দলটা তেমন সুবিধে করতে পারবে না, কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারলো না যে ভিক্টর লজেন গোড়া শক্ত করে বেঁধে নিয়েই মাঠে নেমেছে।

অঢেল টাকা আছে তার, আছে দৈনিক পত্রিকা, রেডিও স্টেশন, এয়ারলাইন, সশস্ত্র সমর্থকবাহিনী। এখন শুধু বাকি নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে কলম্বিয়ার শাসক হওয়া। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে।

রানার মনে হলো, ভিক্টরের হোয়াইট গামা একটা ভুল পদক্ষেপ। রাজনীতিতে এসে নিজেকে মেলে ধরেছে সে। নিজের সাক্ষাৎকার প্রচার করায় কিংবদন্তীর আড়ালের মানুষটা বেরিয়ে পড়েছে, সশস্ত্র একজন স্মাগলার। সে যেন প্রদর্শনীতে সাজানো দর্শনীয় একটা বস্তু। এখানে তাকে পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে লোকজন। সুযোগ পাবে নাড়াচাড়া করার।

দশ

'চেরোকীটা আবার আমার দরকার হবে।

'কেন?' জানতে চাইলো কালভিন। 'তুমি কি ভিক্টর লজেনকে উড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবছো?'

'দি নেক্সট বেস্ট থিং।'

'কি সেটা, আমাকে বলবে?'

'না,' বললো রানা। 'তবে তুমি শুনতে পাবে।'

'তোমার সাথে আমি যাচ্ছি, রানা।'

'তা সম্ভব নয়, টমাস।'

'ওগুলো আমার চাকা,' বললো কালভিন। 'আমাকে ছাড়া কোথাও নাও যেতে পারে।'

'শোনো, তোমাকে আমার এখানে দরকার। কাল একটা জিনিসের নাম আর ঠিকানা চাই আমি। জিনিসটার মালিক ভিক্টর। নোংরা একটা জিনিস। ওটা তোমার খুঁজে বের করতে হবে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আজ তুমি যেটা খুঁজতে যাচ্ছো সেটা খুব পরিষ্কার।'

'তারচেয়েও বেশি,' বললো রানা। 'পবিত্র।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কালভিন, বললো, 'আসলে তুমি চাইছো আমি সাথে থাকি। বাধা দেয়ার ভান করছো আমি যাতে জেদ ধরি।'

'না।'

'কিছু এসে যায় না, কারণ তোমার জিনিসটা, তোমার নোংরা জিনিসটা, এরইমধ্যে পেয়ে গেছি আমি। ভেবেছিলাম পরে জানাবো। তথ্যটার বিনিময়ে আমাকে সাথে নিতে হবে, রানা।'

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'অপারেশনে তুমিও আছো।'

'ভুলেই গিয়েছিলাম সামরিক বাহিনীতে ছিলে তুমি,' আবার মাথা নেড়ে বললো কালভিন। 'আজকাল আর এভাবে কেউ কথা বলে না।

খানিক পর ওদেরকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল চেরোকী, ড্রাইভিং সীটে রানা। উত্তর-পুব দিক ধরে শহর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। পথে দু'বার থামলো রানা, প্রথমবার একটা দোকান থেকে পঞ্চাশ ফুট পাটের রশি কিনলো, দ্বিতীয়বার একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে স্টেক আর ভাজা আলু খেলো। খেতে বসে প্রশ্নটা করলো কালভিন। 'পবিত্র জিনিসটা কিরে, ভাই?'

'প্রতীক,' বললো রানা।

'হেঁয়ালি বাদ দাও, বুঝলে!' বিরক্তি প্রকাশ করলো কালভিন। 'নারকো-হিপনোটিস্ট হও আর যাই হও, তোমাকে স্বীকার করতে হবে, ভুল একটা করেছো। গাদ ইরেজকে ঠিকমতো কথা বলাতে পারলে, ভিক্টর লজেনকে এতোক্ষণে আমরা এক্সট্রাডিশন-যোগ্য হিসেবে পেতে পারতাম।'

'ঠিকমতো মানে তো গ্রেফতার করে ভয় দেখানো, তাই না? ওতে

কোনো কাজ হতো না। পোকাটার কাজ হলো লুপ থেকে সবাইকে কেটে বাদ দেয়া। গ্রেফতার করে কোথায় রাখতে ইংরেজকে, হাজতে তো? সম্রাটরা না চাইলে ওখানে কেউ বাঁচে?'

'আমাদের হাতে একজনও নেই, রানা।'

'লোক নেই, তথ্য আছে,' বললো রানা। 'কয়েকটা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। এবার বলো, লজেনের নোংরা জিনিসটা কি?'

'ডি. এ. এস. কালি-তে একটা কোকেন ল্যাব সম্পর্কে জানতে পেরেছে। হানা দেয়ার জন্যে কাল সেখানে আমার যাওয়ার কথা।' হলুদ একটা আলু পুরোটাই মুখে পুরলো কালভিন, একবার চিবালো, তারপর গিলে ফেললো। 'ওরা সম্ভবত আমার স্বার্থে অপারেশনটার আয়োজন করেছে, আমি যাতে রিপোর্ট করতে পারি এখানে ভালো কিছু কাজ হচ্ছে। তবে, ওদের তথ্যে কোনো ভুল নেই বলেই মনে হয়। অপারেশনে ওদের সেরা একজন অফিসার নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর বিশ্বাস, ল্যাবটা লজেনের।'

'আমি থাকতে পারি?'

'কাল জানাবো, রানা।'

তারমানে, সম্ভবত ওকে সাথে নেয়া হবে না। খাওয়ার মধ্যে আর কোনো কথা হলো না। স্টেকের পর ফল পরিবেশন করা হলো, তিনটে ফল সম্পূর্ণ অচেনা রানার। খাওয়ার পাট চুকিয়ে কিউবান চুরুট ধরালো ও। তাড়াহুড়ো করছে না, কারণ বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে পার্কে পৌঁছুতে চায়। অর্থাৎ দশটায়, অন্তত চারদিকে বিজ্ঞাপন-গুলো তাই বলছে।

ভিক্টর লজেনের থীম পার্ক বারো মাইল উত্তরে, হাইওয়ের কাছা-

কাছি। পার্কের ভেতর কৃত্রিম একটা লেক আছে, লেকে ভেসে বেড়ায় হরেক জাতের হাঁস, চারপাশে গাজেল হরিণ আর ক্যাঙ্গারুর ঘের। প্রায় সবরকম পশু-পাখিই রাখা হয়েছে। ক্যাঙ্গারুদের জন্যে আছে একটা বক্সিং রিঙ। কৃত্রিম খাদে রাখা হয়েছে চিতাবাঘ। বাচ্চাদের সুযোগ আছে হাতি চড়ার। আর আছে নগ্ন জিম মরিসনের মূর্তি, পার্কের প্রবেশমুখে টাওয়ারের মতো উঁচু, পাঁচ ফুট বেদীর ওপর।

বন্ধ হতে মাত্র এক ঘণ্টা বাকি আছে, তাই হাফ টিকেটে প্রবেশাধিকার পেলো ওরা। কোমরে হোলস্টার নিয়ে চারজন গার্ডকে দেখলো রানা, আর কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়লো না। গার্ডরা সবাই তরুণ, ধরে নেয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ তাদেরকে করতে দেয়া হয়নি। একটা নির্দোষ পার্কে গুরুত্বপূর্ণ কি কাজই বা থাকতে পারে?

পার্কের মাঝামাঝি জায়গায় ছোটো একটা প্যাসেঞ্জার প্লেন দেখা গেল, একটা নাগরদোলার চাকা ও উঁচু চাতালের ওপর তৈরি রিফ্রেশমেণ্ট স্ট্যাণ্ডের সাথে তার দিয়ে বাঁধা। একটা মডেল যেন, প্রদর্শনের জন্যে রাখা হয়েছে। খোঁজ নিতে ওদেরকে জানানো হলো, বিনা সংকোচে, এই প্লেনে করেই কোকেনের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গিয়েছিল ভিক্টর লজেন।

কথাটা বলার সময় হাসলো তরুণী মেয়েটা, টেনে-টুনে সিধে করলো বেরেটটা। পার্কের প্রত্যেক অ্যাটেনড্যাণ্ট পরে ওটা। মেয়েটা অবশ্য 'কোকেন' শব্দটা উচ্চারণ করেনি, বললো 'সিলেকটেড এক্সপোর্ট'।

তথ্যটা পাবার পর ইতিকর্তব্য স্থির করা সহজ হলো রানার জন্যে। উপস্থিত অ্যাটেনড্যাণ্টদের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করলো কালভিন, সেই ফাঁকে সবুজ গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিলো রানা। খেলা রেলগাড়ির পিছনে চলে এলো ও। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে প্লেনটার দিকে এগোবার সময় ভয় হলো, অ্যাটেনড্যাণ্টরা

না ওকে দেখে ফেলে। ভয়টা অমূলক, কারণ ওর দেয়া বাহান্নটা তাস নিয়ে ইতিমধ্যে জাদু দেখাতে শুরু করেছে কালভিন, গার্ড বা অ্যাটেন-ড্যান্টদের অন্য কোনো দিকে তাকাবার ফুরসত নেই। পাঁচ মিনিট পর কাজ সেরে ফিরে এলো রানা। বিদায় নেয়ার আগে গার্ডরুমে বসে দু'কাপ কফি খেতে হলো ওদেরকে।

পার্ক থেকে সিকি মাইল এসে ছোটো একটা পাহাড়ের নিচে গাড়ি থামালো রানা। পাথুরে ঢাল বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠলো ওরা। পার্ক বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পার্কটা থেকে তেমন কোনো আয় নেই লজেনের, লোকজন খুব কমই আসে। কর্মীদের গাড়ি ছাড়া বাকি সব যানবাহন পরবর্তী আধ-ঘণ্টার মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে গেল। এক ঘণ্টা পর পার্কিং লটে থাকলো তিনটে মাত্র গাড়ি। তিনটের মধ্যে দুটো নিরাপত্তা অফিসার-দের বলে মনে হলো, অপরটি আবাসিক ম্যানেজারের।

গার্ডদের একজনকে দেখা গেল সামনের গেটের কাছে পায়চারি করছে। তার রেডিওটা উদ্বিগ্ন করে তুললো রানাকে। এভাবে যদি গান বাজতে থাকে, বিস্ফোরণের শব্দ হয়তো শোনাই যাবে না। 'গেট পর্যন্ত হেঁটে যাবো আমি,' কালভিনকে বললো ও। 'নাইট গ্লাস ব্যবহার করবে তুমি। আমাকে গেটের সামনে দেখলে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যাবে।'

আধবোজা চোখে মাথা ঝাঁকালো কালভিন। রানার আইডিয়াটা যদিও তার পছন্দ হয়নি, তবে ওর মাথা থেকে আরো কিছু বেরোবে ভেবে এ নিয়ে তর্ক না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

পাহাড় থেকে নেমে ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করতে করতে হাঁটা ধরলো রানা। ভাবলো জ্যাকেটটা না এনে ভুল করেছে। রাস্তা ছেড়ে, পাশের

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ও। ওর কাঁধে মোটা রশির কুণ্ডলী, মাঝে মধ্যে ঝোপের ডালে আটকে যাচ্ছে। পার্কের গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও, গার্ডরুম আর টিকেট-ঘরটা দেখতে পেলো। সামনেই একটা বিরাট বট গাছ, অসংখ্য ঝুরি নেমে এসেছে নিচে, আড়াল পেতে কোনো অসুবিধে হলো না। গাছ আর গেটের মাঝ-খানে এটাই একমাত্র আড়াল।

পার্কিং লটটা গেটের পাশে, বাইরের দিকে। ওদিকে যাবার আগে গার্ডদের মনোযোগ অন্য কোনো দিকে সরাতে হবে ওর। দেরি করার মানে হয় না ভেবে পকেট থেকে সংকেত পাঠানোর অ্যাকটিভেটর-টা বের করলো ও। চার মাইল রেঞ্জ ওটার। ওর টার্গেট অবশ্য মাত্র তিনশো গজ দূরে।

বোতামে চাপ দেয়ার সাথে সাথে রাতের আকাশ যেন চুরমার হয়ে গেল। অন্ধকার পার্ক নীলচে সাদা অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুহূর্তের জন্যে, আলোকিত হয়ে উঠলো স্ট্যাচু আর টিকেট-ঘর। এক সেকেণ্ড পর সি-ফোর বিস্ফোরণের শব্দটা হলো, যেন বজ্র-পাত হলো কাছে কোথাও।

রাস্তার দিকে পিছন ফিরলো গার্ড। হতভম্ব হয়ে গেছে সে। পার্কের দিকে ফিরে বিধ্বস্ত প্লেনটা দেখছে। শুধু প্লেনটা নয়, তার সাথে খোলা ট্রেনটাও আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। কিছু চিন্তা না করেই সেদিকে ছুটলো সে, হোলস্টার থেকে হাতে চলে এসেছে পিস্তলটা, পিছন ফিরে তাকালো না একবারও।

লোকটা পঞ্চাশ ফুটও এগোয়নি, বটগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রানা। লোকটা একশো গজ এগিয়েছে, পাঁচ ফুট উঁচু বেদীর ওপর উঠে পড়লো ও। জায়গামতো ডেটকর্ড বসাতে দু'মিনিটের বেশি

লাগলো না। এরপর স্ট্যাচুর দুই পায়ে মোটা রশি জড়ালো। কাজটা শেষ করেছে, মূর্তির গোড়ায় ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো চেরোকী।

গাড়িটা ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে রাখলো কালভিন। রশির প্রান্তটা ট্রেইলের হিচ-এর সাথে শক্ত করে বাঁধলো রানা. কালভিনকে সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে নিজে বসলো।

কাজটা প্ল্যান মতো হলো না। গাড়ি ছাড়লো রানা. পেডাল চেপে ধরলো, কিন্তু সামান্য এগিয়ে স্থির হয়ে গেল চেরোকী। চাকাগুলো কাঁকর আর বালি ছড়ালো, প্রতিবাদ করলো, কিন্তু স্ট্যাচুটা নড়লো না। ব্যাক গিয়ার দিয়ে গাড়িটাকে বেদীর গোড়া পর্যন্ত পিছিয়ে আনলো রানা। গিয়ার আবার বদলে চাপ দিলো অ্যাকসিলারেটরে।

খানিক পর রশিতে টান পড়ায় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ওরা, মনে হলো কাঁধ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে মাথা। এবার নড়লো মূর্তিটা যদিও শুধু টলমল করলো, কাত হলো না। চাকাগুলো আবার ঘুরছে, সগর্জনে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে চেরোকী।

ব্যাক গিয়ার দিয়ে আবার পিছিয়ে এলো রানা। আবার সামনের দিকে ছোটালো গাড়ি। এবার কাজ হলো। অতিরিক্ত ধাক্কা দেয়ার জন্যে ডেটকর্ড অ্যাকটিভেট করলো ও। মনে হলো, জিম মরিসনের মাইক্রোফোন জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বে। তবে রশিতে ঢিল পড়ায় চেরোকীর গতিও বাড়লো।

ভোঁতা একটা শব্দের সাথে মূর্তিটার পতন ঘটলো ওদের পিছনে।

'পড়েছে!' চিৎকার করলো রানা। 'রশিটা কেটে দাও!'

শব্দ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার এখন আর কোনো মানে হয় না, লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পকেট থেকে কোল্ট পাইথন বের করে গুলি করলো

কালভিন, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মোটা রশিটা। ক্যাঙ্গারুর মতো আরেক লাফে গাড়িতে ফিরে এলো সে। গাড়ি ছেড়ে দিলো রানা।

পার্কিং লট থেকে তীরবেগে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো ওদের, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। নিরেট আর শক্ত কি যেন একটা পড়ে আছে মাটিতে, তার সাথে গাড়ির বাম পাশ আর সামনেটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। লাফ দিলো চেরোকী, কিন্তু বাধাটা টপকাতে পারলো না, স্থির হয়ে গেল। পাশের জানালা আর ছাদের সাথে ঠুকে গেছে রানার মাথা, কয়েক সেকেণ্ড কিছুই স্মরণ করতে পারলো না। সংবিত ফিরলো কালভিনের চিৎকারে।

'রানা, গাড়ি ছাড়ো! মুভ ইট, ম্যান, মুভ ইট! ওরা আসছে!'

গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে ওরা। গুলির আওয়াজ এতো কাছে, বিস্ফোরণের মতো লাগলো কানে। চেরোকীর পিছনের জানালায় একটা বুলেট লাগলো, মাকড়সার জাল হয়ে গেল কাঁচটা।

পাশের জানালা থেকে মাথা তুলে ব্যাক গিয়ার দিলো রানা, পিছিয়ে আনলো চেরোকী, এঞ্জিনে প্রচুর গ্যাস ভরলো। যান্ত্রিক গর্জনের সাথে কর্কশ সংঘর্ষের আওয়াজ হলো, পরমুহূর্তে বাধাটা টপকে এলো গাড়ি। দিকভ্রান্ত হয়ে বৃত্ত রচনা করতে যাচ্ছে চেরোকী, হুইল ঘুরিয়ে সেটাকে সিধে করলো রানা, সামনের দিকে ছোটালো। কাঁকর আর নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে উঠে এলো কংক্রিটের রাস্তায়।

'ক্ষয়ক্ষতির জন্যে দুঃখিত,' বললো রানা। 'তবে কি জানো, আমার বহুদিনের ইচ্ছে একটা স্ট্যাচু ফেলে দিই।'

পার্ক পাঁচ মাইল পিছনে ফেলে আসার পর এই প্রথম মন খুলে হাসলো কালভিন। 'গাড়ির জন্যে দুঃখ করো না, রানা,' বললো সে।

'তুমি পুষিয়ে দিয়েছো।'

চেরোকী ভালো চলছে না। স্টিয়ারিং তিরিশ ডিগ্রীর মতো বাঁকা করে রাখলে রাস্তার ওপর সোজা থাকছে ওটা। গাড়ির একটা পাশ আর সামনের দিকটা ভেঙেচুরে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বাতাসে গ্যাসোলিনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। 'বেশ, কিন্তু কাল কি হবে?'

'কালির কথা বলছো?'

'তাছাড়া কি!'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল কালভিন। 'আচ্ছা, শেষ যে বিস্ফোরণের শব্দটা পেলাম, ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'শেষ বিস্ফোরণ?'

'স্ট্যাচুটা যখন পড়তে শুরু করলো। সি-ফোর আমি চিনি, রানা। ওটা সি-ফোর ছিলো না।'

'ছিলো এক ফুট লম্বা ডেটকর্ড-এর একটা টুকরো,' বললো রানা। 'বেঁধে রেখে এসেছিলাম। স্ট্যাচুর বিশেষ একটা জায়গায়।'

'বিশেষ জায়গায়…কি রকম?'

'ওটা আমি জড়িয়ে দিয়েছিলাম স্ট্যাচুর ডিক-এ।'

'ডিক!' আর্তনাদ করে উঠলো কালভিন। 'মাই গড! তোমার এতো স্পর্ধা! তুমি ভিক্টর লজেনের গুরু জিম মরিসনের টেসটিকল উড়িয়ে দিয়েছো! একজন কলম্বিয়ানকে তুমি এভাবে অপমান করলে! জানো, এর পরিণতি কি হতে পারে?'

'আমি তোমাকে বলিনি, প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

হেসে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো কালভিন। 'তুমি আসলে ভিক্টরকে জানাতে চাইছো, তুমি তাকে ধাওয়া করবে, তাই না?'

'জানাতে চাই, কেউ একজন তাকে ধাওয়া করবে।'

'ঠিক আছে,' বললো কালভিন। 'কাল তুমি প্লেনে থাকছো।'

এগারো

মেডিলিন থেকে বিমানে মাত্র এক ঘণ্টার পথ কালি। কাউকা উপত্য-কার দিকে প্রায় নাক বরাবর সোজা দক্ষিণে শহরটা। মহাদেশের সব-চেয়ে উর্বরা এলাকাগুলোর মধ্যে একটা। সম্ভাব্য প্রায় সব কিছুই ওখানে জন্মায়, তবে অর্থকরী ফসল হলো আখ, তুলো, কফি আর কোকা। বিশাল সব পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে উপত্যকাটা। কালির অবস্থান টিয়েরা টেমপালাডা-য়। টিয়েরা টেমপালাডা মানে হলো টেমপারেচার জোন, যেখানে বাস করা ও চাষ করা ছুটোই লাভ-জনক। তবে কালি সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র তিন হাজার ফুট উঁচুতে হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া বেশ গরম।

মার্কো সুয়ারেজ এয়ারফোর্স বেস থেকে একটা পুরনো ডজ ভ্যান নিয়ে রওনা হলো ওরা। রাস্তার ছু'পাশে আখখেত, ঘাম চকচকে মুখ নিয়ে খেতে কাজ করছে কালো তরুণীরা, ওদেরকে দেখে হাত নাড়লো। ভ্যানের ভেতর গরমে হাঁসফাঁস করছে ওরা, রানা বাদে আর কেউ সাড়া দিলো না।

ভ্যানের ড্রাইভার সাদা কাপড়ে ডি. এ. এস.-এর একজন কর্পো-

য়াল। লোকটা তরুণ, ইণ্ডিয়ান, চুপচাপ। কালি ইণ্ডিয়ানদের শহর, বিভিন্ন গোত্রের আদিবাসীরা এসে কলম্বিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহরে পরিণত করেছে এটাকে। শহরের ভেতর ও বাইরে বস্তিগুলো যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধময়। ড্রেনের পাশে খুপরি কাদামাটিতে শুয়ে বসে আছে গাদা গাদা হাড্ডিসার, রুগ্ন, নগ্ন শিশু—বাংলাদেশী দুর্ভাগাদের কথা মনে করিয়ে দিলো রানাকে।

কোকেন প্রসেস করার কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে কালির। দক্ষিণে সীমান্ত কাছে হওয়ায় বলিভিয়া আর পেরু থেকে অবাধে ও সস্তায় কাঁচামাল পাবার সুবিধে আছে। স্থানীয় ফার্মগুলোও যথেষ্ট কোকা পাতা সরবরাহ করে। স্থানীয়ভাবে কোকা পাতার চাষ হয় বেশির ভাগ পারিবারিক খেতে। কাউকা উপত্যকায় এ-ধরনের খেতের কোনো অভাব নেই। কলম্বিয়ান ড্রাগ ব্যবসার ব্রেন বলা হয় মেডি-লিনকে, আর কালিকে বলা হয় ওয়ার্কিং মাসল।

'যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি,' রানাকে জানালো কালভিন, 'তাকে তুমি দুটোই বলতে পারো—কার্টেলের বিরুদ্ধে ব্রেন ও মাসল।'

কালভিনের বর্ণনা থেকে জানা গেল, কর্নেল হার্নান্দেজ বেনিন একটা জ্যান্ত মিরাকল, তাঁর মতো সৎ, সাহসী ও বুদ্ধিমান ইনভেস্টিগেটর গোটা কলম্বিয়ায় দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। ড্রাগ ব্যবসা বন্ধ করার জন্যে যতোটা মনোযোগী তিনি, ততোটাই কম মনোযোগী দীর্ঘায়ুর প্রতি। ডি. এ. এস.-এর উঁচু পদে আসীন থাকায় রাজনীতিক বা অন্যান্য ইনফর্মাররা তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে খুব কমই উঁকি-ঝুঁকি মারার সুযোগ পায়।

'আজকের অপারেশন সম্পর্কে কাউকে তিনি কিছু জানতে দেননি,' বললো কালভিন। 'ডিপার্টমেন্টের কেউ কিছু জানে না, বাইরের

লোকেরাও জানে না। এমনকি অ্যাসল্ট ইউনিটকেও টার্গেট সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি, তারা জানবে স্পটে পৌঁছুনোর পর।'

'তাঁকে বলবে, অ্যাসল্ট টিমের কোনো দরকার নেই।'

'আমি তাঁকে কিছুই বলবো না। তুমিও তাঁকে ঠ্যালা-গুঁতো দিতে চেষ্টা করো না। গোটা ব্যাপারটাকে তুমি ব্যক্তিগত যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছো দেখে আমি উদ্বিগ্ন, রানা।'

'তোমরা, আমেরিকানরা, কিভাবে যে এতো বড়ো একটা অন্যায় বছরের পর বছর ধরে সহ্য করছো, আমি জানি না। অস্ত্র, লোকবল, সম্পদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, কিছুরই তো অভাব নেই তোমাদের, অথচ কলম্বিয়ান কার্টেল ঠিকই তোমাদেরকে নিয়মিত বিষ খাইয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত যুদ্ধ? হ্যাঁ, তা বলতে পারো। কলম্বিয়ার কোকেন আমার দেশ—বাংলাদেশে যাচ্ছে জানার পর ব্যাপারটা আমি যুদ্ধ হিসেবেই নিয়েছি। এমনিতেই আমাদের সমস্যার কোনো সীমা নেই, তার ওপর আরেকটা অভিশাপ আমরা মেনে নিতে পারি না।'

'এ-কথা তাহলে সত্যি নয় যে তোমার এই যুদ্ধের পিছনে লিলিয়ানও একটা কারণ?'

'তার ব্যাপারটাও আছে।'

'তুমি তাকে ভালোবাসো?'

'আমরা বন্ধু, টমাস,' বললো রানা। 'যেমন তুমি আর আমি।'

'তোমাকে আমি মাঝেমধ্যে একেবারেই বুঝতে পারি না,' গম্ভীর সুরে বললো কালভিন। 'লিলিয়ান একটা মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, এটা তুমি অস্বীকার করো কিভাবে?'

'কে অস্বীকার করছে?'

'তাহলে স্বীকার করো, লিলিয়ানের সাথে তোমার সম্পর্কটা শুধু

বন্ধুত্বের নয়, তারচেয়েও বেশি কিছু।'

'তোমার সাথেও আমার সম্পর্ক শুধু বন্ধুত্বের নয়, কালভিন। তুমি একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো।'

'তার আগে তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে-ছিলে,' মনে করিয়ে দিলো কালভিন।

'তুমি জানো না, লিলি আমাকে ল্যাংলিতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখার, এমনকি কোর্টে পাঠিয়ে শাস্তি দেয়ার সুযোগও পেয়েছিল। সুযোগটা নেয়নি সে।'

'তাহলে বলো, প্রতিদান দিচ্ছো।'

'দেয়ার সুযোগ পেলে ধন্য মনে করবো নিজেকে। শুধু লিলিকে নয়, টমাস—দুনিয়ায় আমার জন্ম হয়েছে সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, ঋণী; তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে, খানিকটা ঋণ শোধ করার জন্যে ভালো কিছু কাজ আমাকে করতে হবে।'

'সেজন্যে যদি এলোপাতাড়ি খুন করতে হয় তাতেও তোমার আপত্তি নেই।'

'ভুল করছো, টমাস। লা ব্লানকা নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, সে গুরুত্ব দেয়নি।'

'ব্যাখ্যাটা দেরিতে হলেও পেলাম,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো কালভিন।

'কি জানো, এরা টেররিস্ট, প্রচলিত নিয়মে এদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। তবু আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু জেনে রাখো, যদি দেখি সুবিধে করতে পারছি না, আমি কোনো নিয়ম মানবো না।'

'তুমিও ওদের মতো টেরর হয়ে উঠবে?'

'ইচ্ছে করলে আমি তা হতে পারি।'

'তা আমি জানি।'

এক সেকেণ্ড পর রানা চ্যালেঞ্জের সুরে বললো, 'আমার পিস্তলটা চাও তুমি?'

'না,' মাথা নাড়লো কালভিন। 'তোমার সুইস রিপিটার দরকার নেই আমার। তবে বেনিনের লাগতে পারে।'

মিলিত হওয়ার নির্দিষ্ট জায়গায় কর্নেল বেনিনকে পাওয়া গেল না। অ্যাভেনিডা কলম্বিয়ায় ছোটো একটা কফি শপ, রাস্তা থেকে কয়েকটা ধাপ বেয়ে উঠতে হয়। কফি শপের দেয়ালে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন কেটে সাঁটা হয়েছে, বেশিরভাগই চিত্রনায়িকাদের অর্ধ উলঙ্গ ছবি।

প্রায় আধ ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে। তারপর বুলগেরিয়ান ওয়েট লিফটার-এর কাঠামো নিয়ে বিশাল এক লোক ঢুকলো ভেতরে। বিপজ্জনক করমর্দনের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে নিলো রানা, কিন্তু লোকটা ওদেরকে ছাড়িয়ে গেল, বসলো মাঝ-খানে কয়েকটা টেবিল রেখে এক কোণে। কফি শপের পিছন দিকে বসলো, কিন্তু তার সমস্ত মনোযোগ সামনের দিকে। এক এক করে ভেতরের ষোলোটা টেবিলই পরীক্ষা করলো সে। ধাপগুলোর নিচে ফেলা টেবিলগুলোও বাদ দিলো না।

'বডিগার্ড,' রানাকে বললো কালভিন।

তিরিশ সেকেণ্ড পর আরো একজন ঢুকলো, প্রথম লোকটার যমজ ভাই যেন। দরজার কাছাকাছি একটা টেবিলে বসলো সে। আরো তিরিশ সেকেণ্ড পর তৃতীয় ব্যক্তির উদয় হলো। শান্তভাবে ভেতরে ঢুকলেন তিনি, এদিক ওদিক তাকালেন না, যেন নিরাপত্তা সম্পর্কে তার কোনো উদ্বেগ নেই। সোজা এগিয়ে এলেন কালভিনের দিকে,

কালভিন উঠে দাঁড়াতে বুকে টেনে নিলেন তাকে। কালভিনের মতোই লম্বা তিনি, ঋজু, গায়ের চামড়া রোদে পোড়া তামাটে।

পরিচয় ও কুশল বিনিময়ে মিনিট পাঁচেক ব্যয় হলো। আনুষ্ঠানিকতার জন্যে সময় দেয়া যাবে না বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কর্নেল জানালেন, 'এখুনি আমাদের রওনা হতে হবে।' রানার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে হলো না, পরিচয় বিনিময়ের সময় করমর্দন করেছেন স্রেফ নিয়ম রক্ষার জন্যে। তবে গাড়িতে ওঠার সাথে সাথে রানার প্রতি মনোযোগ দিলেন তিনি। গাড়িটা পুরনো একটা বুইক সিডান।

'রানা,' ভদ্রলোকের ইংরেজিতে এতো বেশি আঞ্চলিক টান যে মনে হলো সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছেন। 'বাংলাদেশে নামটা কি অনেকেই ব্যবহার করে ?'

'আমার জন্যে খুশির ব্যাপার—করে,' বললো রানা। যারা দুর্লভ নাম পছন্দ করে রানা তাদের দলে পড়ে না।

কর্নেল বেনিন হাসলেন, হাসিটা মিছরির ছুরি নাকি জল্লাদের নির্দয়তা, রানা ঠিক বুঝতে পারলো না। 'আপনি কি জানেন, এই একই নামের এক ব্যক্তি মেডিলিনে অ্যাক্সিডেণ্ট করেছেন ? ভদ্রলোকের হোটেল স্যুইট একেবারে পাউডার করে দেয়া হয়েছে।'

'ভদ্রলোকের বাঁ হাতটা সম্ভবত প্রায় অকেজো হয়ে আছে, কর্নেল।'

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু আমি শুনেছি, তিনি নাকি তাঁর সরকারের বাম হাতের সাথে যুক্ত। বলা হয় অসাধারণ নিপুণ, দক্ষ ও বিস্ময়কর একজন মানুষ। সম্ভবত একজন ল্যাণ্ড-বেসড্ মেরিনার।'

ব্যাপারটা আর কৌতুক থাকলো না, কারণ ডি. এ. এস.-এর কারো পক্ষে রানার অপারেশন্যাল নাম জানার কথা নয়। রানাই

গোয়েন্দার। এবারের অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে বি. সি. আই. হেডকোয়া-র্টার ঢাকা থেকে নামটা দেয়া হয়েছে ওকে।

'আমার দিকে তাকিয়ো না,' তাড়াতাড়ি বললো কালভিন। 'নিজস্ব উৎস আছে কর্নেলের।'

'সেই উৎসটা সম্পর্কেই জানতে চাই আমি।'

আবার হাসলেন কর্নেল বেনিন। রোদে পোড়া মুখে সাদা দাঁতগুলো আরো সাদা লাগলো। 'আমি আসলে কিছুই ফাঁস করিনি, মেজর রানা। আমি শুধু নিজের ভঙ্গিতে আপনাকে জানাতে চেয়েছি যে আপনি আমাদের দেশে পরিচিত। এমন হতে পারে যে কিছু মন্দ লোক কারেন্সিতে আপনার নাম লিখে বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছে।'

মন্দ লোক, ভাবলো রানা। কর্নেল কাদের কথা বলছেন অনুমান করতে পারলো ও। 'এই লোকগুলো কি, কর্নেল, ব্যানানা ক্রপ সম্পর্কে হিসাব আর গবেষণা করে? পরিচয়হীন সেক্রেটারি, ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের সাথে জড়িত?'

'হতে পারে,' বললেন কর্নেল। 'অঙ্ক আর সংখ্যা নিয়ে আমেরিকান ইকোনমিক অ্যাডভাইজারদের বাড়াবাড়ি আমার অদ্ভুত লাগে। এতো এতো লোক শুধু গোনার কাজে ব্যস্ত, কারণটা আমার বোধগম্য নয়।'

'তবে আমার কাছে কারণটা পরিষ্কার হয়ে যায়, ওরা যখন আমার মাথার দাম হিসেবে টাকা গোনে,' বললো রানা।

'সেজন্যেই তো আপনি আমার ভাই, মিঃ রানা। এই বান্দার মাথার জন্যেও আজ অনেক দিন হলো নগদ এক লাখ ডলার অফার করা হয়েছে। আমাদের মতো আরো যারা আছে, সবাই মিলে একটা সামাজিক ক্লাব গড়ে তুলতে পারি।'

'ভিক্টর লজেনের বন্ধুগোষ্ঠী ।'

'সংখ্যায় তারা কম নয়,' বললেন কর্নেল। 'ধারণা করা হয়, ক্যাশিয়ারদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক আছে।'

কানের পিছনটা চুলকালো রানা। ও জানে, ববি মুয়েলারের সাথে সি. আই. এ.-র একটা সম্পর্ক ছিলো। ববির সাথে সি. আই. এ.-র যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় লিলিয়ান। কাজটা করার পিছনে গোপন উদ্দেশ্য ছিলো লিলির, একটা অন্যায় ষড়যন্ত্র উন্মোচিত করার চেষ্টা করছিল সে। দেরিতে হলেও, সি. আই. এ. ব্যাপারটা জেনে ফেলে। এরইমধ্যে লিলিকে তারা খুন করে ফেলতো, করেনি বিরাট ক্ষতি করার হুমকি দেয়ায়। রানার অনুরোধে বি. সি. আই., সেই সাথে রানা এজেন্সি এসপিওনাজ জগতে রটিয়ে দিয়েছে, লিলির কোনো ক্ষতি হলে সি. আই. এ.-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তারা। সে-জন্যেই লিলির দিকে হাত বাড়াচ্ছে না ওরা, আর রানার দিকে হাত বাড়াচ্ছে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে। রানার মনে কোনো সন্দেহ নেই, লজেন আর কার্টেলকে ওর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে সি. আই. এ.। এই কথাটাই আভাসে বলতে চাইছেন কর্নেল বেনিন।

'এক লোক আমাকে বলেছে, তার জানার কথা, ব্যানানা গণনা-কারীদের সাথে কার্টেলের নাকি ভালো সম্পর্ক আছে,' বললো রানা, জ্যাক মরিসের কথা মনে পড়ে গেছে ওর। 'কলম্বিয়ায় এই সময় আমার উপস্থিতি দু'পক্ষের জন্যেই উদ্বেগের বিষয়।'

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল বেনিন। 'শুনেছি মোটা অঙ্কের টাকা হাত-বদল হচ্ছে।'

এটা রানার জন্যে নতুন একটা তথ্য। 'টাকার স্রোত কোনদিকে?' জানতে চাইলো ও।

'কার্টেল থেকে ব্যানানা গণনাকারী বা ক্যাশিয়ারদের দিকে,' বললেন কর্নেল। 'আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছে।'

'আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না,' বললো রানা, যদিও সি. আই. এ. ও মার্কিন প্রশাসন সম্পর্কে ভালো করেই জানে ও। নিকারাগুয়ান যুদ্ধের খরচ যোগানোর জন্যে যে-কোনো উৎস থেকে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করেছে ওরা, ভালো-মন্দ বাছ বিচার করেনি।

'কথাটা আমারও কানে এসেছে, রানা।'

টমাস কালভিনও যদি শুনে থাকে, ব্যাপারটা স্রেফ গুজব হতে পারে না। তার তথ্যের উৎস সব সময় নির্ভরযোগ্য। 'তুমি শুনেছো সি. আই. এ.-তে ঢুকে পড়েছে কার্টেল।'

'হ্যাঁ,' বললো কালভিন।

'উল্টোটা নয়।'

'না,' বললো কালভিন। 'তবে, আগে বা পরে ব্যাপারটা এক সময় উল্টো হয়েই দেখা দেয়।'

কথাটা সত্যি। এরইমধ্যে তা ঘটেছে। টাকা সংগ্রহের জন্যে ববি মুয়েলারকে ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করেছে সি. আই. এ.। এই ঘটনাটাই সি. আই. এ.-তে কার্টেলের ঢুকে পড়ার সমতুল্য। কিন্তু সি. আই. এ. ববি মুয়েলারের ইতিহাস নিশ্চয়ই জানতো, অর্থাৎ তার মাধ্যমে সি. আই. এ.-ও কার্টেলে ঢুকে পড়ে। ববির সাথে ভিক্টরের কি সম্পর্ক সি. আই. এ. তা জানতো না, এ হতে পারে না। 'আমরা কতো টাকা নিয়ে আলোচনা করছি এখানে?' জানতে চাইলো রানা।

'আমি শুনেছি কয়েক মিলিয়ন,' বললো কালভিন। 'ডলার, অবশ্যই।'

'কয়েক মিলিয়ন,' কর্নেলও মাথা ঝাঁকালেন।

কার্টেলের সামর্থ্য সম্পর্কে রানা কোনো প্রশ্ন তুললো না, কলম্বিয়ায় আসার পর চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নেয়ার যথেষ্ট সময় পেয়েছে ও।

রাস্তা ছেড়ে মেঠো একটা পথ ধরলো সিডান। উপত্যকার ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে পথটা। শহর দশ মাইল পিছনে ফেলে এলো ওরা। সামনে পাঁচিল ঘেরা একটা হাসিয়েনদা দেখা গেল, এককালে বিশাল ক্যাটল র‍্যাঞ্চ ছিলো। লালচে ইঁটের কাঠামো ছাড়িয়ে বাঁ দিকে আরো কিছু ছোটোখাটো দালান-কোঠা রয়েছে, গুদাম ও গোলাঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। দূর থেকে সব খালি বলে মনে হলো। নির্জন, খাঁ-খাঁ করছে। দালান-কোঠাগুলোকে বৃত্তাকারে ঘিরে আছে ইউক্যালিপটাস, কয়েক শো গজ লম্বা পথের দু'পাশেও একই গাছ, পথটা চলে গেছে ঝর্না আর ছোটো একটা পুকুরের দিকে। ভারি সুন্দর জায়গাটা, আশপাশের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন, দলবল নিয়ে চুপিসারে পৌঁছুনো কঠিন।

সবচেয়ে ভালো হতো হেলিকপ্টার নিয়ে এলে। কিন্তু হেলিকপ্টার পেতে হলে দু'দিন আগে চাইতে হবে কর্নেল বেনিনকে। আর আট-চল্লিশ ঘণ্টা দেরি করলে কেমিস্টরা হয়তো বিপদের গন্ধ পেয়ে যেতো বাতাসে।

কর্নেলের লোকেরা নাকি দক্ষ ও সৎ, রানাকে জানালো কালভিন। কর্নেল নিজে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও, নারকো-ডলারের লোভ কে সামলাতে পারবে কে পারবে না, বলা কঠিন। এতো দিনে ডি. এ. এস.-এর চীফ হয়ে যেতে পারতেন বেনিন, যদি না গত বছর এ-ধরনের একটা অপারেশনে বেঈমানী করার জন্যে নিজের দু'জন লোককে তিনি খুন করতেন।

শুকনো একটা চওড়া নালায় নেমে এলো বুইক সিডান। কমিউনি-

কেশন ইকুইপমেন্ট বের করা হলো, তোলা হলো নালার কিনারা ঘেঁষা ছোটো একটা ঢিবির মাথায়, ওটাকেই কমাণ্ড পোস্ট হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এতোক্ষণে অ্যাসল্ট স্কোয়াডের সাথে যোগা-যোগ করলেন কর্নেল বেনিন। এখান থেকে দু'মাইল পিছনে কোথাও জড়ো হয়েছে তারা।

চারদিকে তাকিয়ে লম্বা ঝোপ দেখতে পেলো রানা, আন্দাজ করলো মারিজুয়ানা হবে।

'তাই,' বললো কালভিন।

কর্নেলের ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক হাসিটাও যেন নির্দয় জল্লাদের। 'কোকা ছাড়াও কলম্বিয়ায় কয়েক শো ধরনের হ্যালুসিনোজেনিক প্ল্যান্ট জন্মায়, মিঃ রানা। কিছু কিছু বনে-জঙ্গলে আপনা থেকেই বাড়ে। আমার সন্দেহ আছে হারামীরা জানে কিনা এখানে এগুলো আছে। জানলেও গুরুত্ব দেবে বলে মনে হয় না। মারিমবা আজকাল কৌলিন্য হারি-য়েছে, সবাই এখন কোকেনের ভক্ত।'

কলম্বিয়ায় আসার পর থেকে বহুলোককে ঝিমাতে দেখেছে রানা, কারণটা বোঝা গেল। মাদক সরবরাহের ব্যাপারে প্রকৃতি এখানে উদার, তারই সন্তান ভিক্টর লজেন নিষ্ঠার সাথে ভাই-বেরাদারদের মধ্যে বিলি করছে জিনিসটা। কর্নেলের দিকে ফিরে রানা বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'আপনারা সামলাচ্ছেন কিভাবে?'

'কাজটা সহজ নয়, মিঃ রানা। যদি কোনো আইন না থাকতো, এতোদিনে আমরা গোটা কলম্বিয়া থেকে ওদেরকে গায়েব করে দিতে পারতাম। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে ওদের সবার অ্যাপার্টমেন্ট নি-ফোর দিয়ে উড়িয়ে দিতাম।'

কথাটা শুনতে ভালো লাগলো না রানার। লা ব্লানকার মৃত্যু সম্প-

কিন্ত বিবরণ বেশিদিন গোপন থাকবে না জানতো ও, তবে কর্নেল যদি এরইমধ্যে জেনে থাকেন, ধরে নিতে হবে কার্টেলও জেনে ফেলেছে। মাথা নাড়লো ও, বললো, 'আমার বিশ্বাস, আইন থাক-তেই হবে। অবশ্য দু'একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে।'

একটা হাত বাড়িয়ে রানার কাঁধ ধরলেন কর্নেল। চাপ বাড়লো, তবে ব্যথা পাবার মতো নয়। 'আমার ধারণা ছিলো না বিস্ফোরক কেউ এভাবে সাজাতে পারে। অ্যাপার্টমেন্টটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল ফার্নিচার আর লোকজনসহ অথচ পাশের অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে শুধু সামান্য একটু চিড় ধরলো, তিনটে বাচ্চা নিয়ে সুখী দম্পতির ফটোটা পর্যন্ত দেয়াল থেকে পড়লো না!'

'মানতেই হবে, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কর্নেল। আমি বলবো, কপাল।'

'সম্ভবত,' বললেন বেনিন। 'কিন্তু মিউনিশন এক্সপার্টরা রাস্তার উল্টোদিকে বিধ্বস্ত একটা তেরোতলার টয়লেটটাও পরীক্ষা করেছে। পরীক্ষা করার আসলে কিছু ছিলো না, দেখে মনে হয়েছে অ্যাটম বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেটা।'

'পয়ঃনিষ্কাশনের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটা কাজ।'

'জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়, এমন কোনো কাজ আমরা বরদাস্ত করতে পারি না,' বললেন কর্নেল। 'কাজটার জন্যে দায়ী ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত থাকলে, তাকে আমি বলতাম, অযথা বারুদ খরচ কর-বেন না।'

'ঠিক আছে, দেখা হলে কথাটা তাকে আমি জানিয়ে দেবো।'

রানার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে হেসে উঠলেন কর্নেল। 'তাকে আরো জানিয়ে দেবেন, প্লিজ,' বললেন তিনি, 'বাস্কো কুইনকে বিদায়

করে দেয়ায় আমি ভারি খুশি হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, ভদ্র-লোকের প্রতি আমরা কলম্বিয়ানরা কৃতজ্ঞ। তার কারণও আছে।'

'বাসুকো কুইন, বাহ্!'

'পরিশোধিত কোকেন, মিঃ রানা, ধনীলোকের বখাটে ছেলেরা কেনে,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু বাসুকো সস্তা, নিম্নমধ্যবিত্ত আর গরীব পরিবারের বেকার যুবকদের মাথাগুলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে। বাসুকো কুইন বিদায় নেয়ায় সরবরাহে প্রচণ্ড বিঘ্ন ঘটবে বলে আমার ধারণা। ভদ্রলোক সত্যি একটা কাজের কাজ করেছেন। সি-ফোর সত্যি খুব কাজের জিনিস, উপযুক্ত হাতে পড়লে।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকালো রানা।

'শুনেছি,' কর্নেল বললেন, 'মেডিলিনের হোটেল স্যুইটেও নাকি এই একই জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল।'

'আপনি বলতে চাইছেন, ভদ্রলোক জেনুইন সেন্স অভ হিউমার-এর অধিকারী?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'আমার তাই ধারণা। আমার ধারণা, বিরাট বিরাট সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হয় তিনি জানেন। তিনি যদি এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে কোকেন র‍্যাঞ্চে চুপিসারে ঢোকার একটা চমৎকার উপায় বাতলাতে পারতেন আমাদের।'

উপত্যকার মেঝেতে বুইকটা পৌঁছুনোর পর থেকে এই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে রানা। নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো ও। গোটা একটা দলকে নয়, কারো চোখে ধরা না পড়ে হাসিয়েনদার ভেতর মাত্র একজন লোককে প্রথমে ঢোকাতে চায় ও। মেইন বাঙ্ক [illegible] নেবে সে, সাথে থাকবে অটোমেটিক রাইফেল, ফলে

হাসিয়েনদার ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত কাভার দিতে পারবে সে। তার-পর অ্যাসল্ট স্কোয়াড ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে।

'কিন্তু ভদ্রলোককে যদি গার্ডরা এগোতে দেখে ফেলে?'

'আমরা যে লোকের কথা আলোচনা করছি, তাকে দেখতে পাবে না,' বললো রানা। 'তবে সে একটা সুবিধে চাইতে পারে।'

'কি হতে পারে সেটা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলেন বেনিন।

'বিশ ফুট লম্বা প্রাইমাকর্ড,' বললো রানা। 'দুই কেস গ্রেনেড—একটা কনকাশন, একটা ইনসেনডিয়ারি। এ-সব তাকে ডেলিভারি দিতে হবে এখানকার অপারেশন সফল হবার পর।'

'পজিশনে পৌঁছুতে কতোক্ষণ সময় লাগবে আপনার, মিঃ রানা?'

'পঁচিশ মিনিট,' বললো রানা, সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়ে স্বস্তিবোধ করলো।

সজোরে রানার কাঁধ চাপড়ে দিলেন কর্নেল। 'আমি রাজি।'

হাসিয়েনদার চারদিকে আট ফুট উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় কাঁচের টুকরো গাঁথা, তার ওপর তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়াও আছে। কোনোটাকেই সমস্যা বলে মনে করলো না রানা।

প্রতিটি পুরনো পাঁচিলে দুর্বল জায়গা থাকবে। দুটো খুঁজে পেলো রানা, দক্ষিণ দিকে দুটো পাঁচিল যেখানে এক হয়েছে, আর পশ্চিম ভাগের শুরুতে একটা গাছ যেখানে পাঁচিল টপকে ভেতর দিকে ঝুঁকে আছে। দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করার পর সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেল রানা। হাসিয়েনদার ভেতরে যদি আধুনিক সেনসর ইকুইপমেন্ট থাকে, ওই দুর্বল জায়গাগুলোর দিকেই বিশেষ ভাবে তাক করা আছে।

শুকনো নালার ভেতর দিয়ে এগোলো রানা। একটা গিরিখাদের

তলা দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলো, হাসিয়েনদাকে চক্কর দিচ্ছে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে গিরিখাদের মেঝে, সামনে এক সময় পানি দেখা গেল। রওনা হবার আগে কাপড়চোপড় ছেড়ে শুধু শর্টস্ পরেছে রানা, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সব সাইড পকেটে ভরে নিয়েছে। পানির কিনারায় পৌঁছে চারদিকটা ভালো করে দেখে নিলো ও, তারপর নেমে পড়লো।

ঘোলা পানি, সাপ থাকলেও সহজে চোখে পড়বে না। শির শির করে উঠলো গা।

পানি কম, মাত্র কোমর সমান, দাঁড়ালেই কারো চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে। দূরত্বটা পেরোবার সময় পানির ওপর একবারও মাথা তুললো না রানা। পাঁচিলের কাছে পৌঁছুলো ও, দেখলো খাদটা ভেতর দিকে চলে গেছে। কী রিঙ দিয়ে ড্রেনেজ ওয়্যার কাটলো ও।

ট্র্যাপ কাটার পর আবার পানির নিচে ডুব দিলো রানা, পাঁচিলের তলা দিয়ে ঢুকে পড়লো হাসিয়েনদার ভেতর। পানির ওপর মাথা তুলে চারদিকটা দেখার পর আবার পাঁচিলের বাইরে বেরিয়ে এলো ও, অল-ওয়েদার ব্যাগে ভরা উজি মডেল বি-টা নিয়ে এলো। কর্নেলের উপহার, নাইন এমএম, ম্যাক্সিমাম ফায়ারিং রেট প্রতি মিনিটে ছ'শো রাউণ্ড।

দ্বিতীয়বার পাঁচিল গলে ভেতরে ঢোকার পর আরো বিশ ফুট সাঁতার কেটে এগোলো রানা। ওর পাশে একটা লম্বা দোচালা দেখা গেল, দেয়ালগুলো নেই বললেই চলে। পানি থেকে শুকনো মাটিতে উঠে তিন মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকলো ও। কাউকে দেখা গেল না, কিছু নড়ছে না, ইতিমধ্যে শুকিয়ে এলো শরীরটা। পোর্টেবল জেনারেটরের আওয়াজ বাকি সব শব্দকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সূক্ষ্ম কোনো

শব্দ রানা যেমন শুনতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না প্রতিপক্ষও।

খোলা মাঠের ওদিকে বাঙ্কহাউসটা, তিরিশ গজ দূরে। ভেতরে কেউ থাকতে পারে ভেবে তাকিয়ে ছিলো রানা, এক লোক বেরিয়ে এলো। পরনে খাকি শার্ট, চোখে চশমা, রানার মতোই লম্বা। কাপড়চোপড় অনেকটাই রানার মতো, কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

লোকটা নিরস্ত্র। এ-থেকে অবশ্য কিছু বোঝা যায় না। অস্ত্র থাকলেই যে সেটা সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তার কোনো মানে নেই। এখানে যদি কোকেন প্রসেসিং ল্যাব-এর অস্তিত্ব থাকে, হাসিয়েনদার প্রতিটি ঘরে অস্ত্র থাকার কথা।

পিছনের একটা দরজা-দিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকলো লোকটা। দরজায় পর্দা ঝুলছে। লোকটা ফিরে আসতে পারে ভেবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো রানা। তারপর পানির কিনারায় সিধে হয়ে দাঁড়ালো, খোলা জায়গাটা ধরে শান্ত সতর্কতার সাথে সামনে বাড়লো। ব্যাগে ভরা উজিটা ওর বাঁ পায়ের সাথে আটকানো। পাঁচটা ক্লিপ পকেটে।

এগোচ্ছে বাঙ্কহাউসের দিকে, দরজা-খোলা একটা গোলাঘরকে পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ভেতরে টয়োটা পিকআপ, মিতসুবিসি কার্গো ভ্যান, আর একটা স্পোর্টস-মডেল নিশান রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পা দিয়েছে জাপানীরা। হুডগুলো তুলতে চার মিনিট সময় লাগলো রানার, অলটারনেটরের সাথে সংযুক্ত তারগুলো খুলতে আরো দু'মিনিট ব্যয় হলো। কোনো শব্দ না করে, ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলো হুড।

গোলাঘরে পিছনেও একটা দরজা রয়েছে, অদ্ভুত ব্যাপার। সেটা দিয়ে বেরিয়ে হাসিয়েনদার বাইরের পাঁচিল আর গোলাঘরে মাঝখান দিয়ে ছ'ফুটের মতো এগোলো রানা, পৌঁছে গেল বাঙ্কহাউসের পিছনে।

তিনটে জানালা, হা-হা করছে। দেয়াল ঘেঁষে প্রথমটার দিকে এক ইঞ্চি করে এগোলো রানা। উঁকি দিতেই চোখ পড়লো এক লোকের ওপর। একটা ফিল্ড কট-এ শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ, নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ছে। ভেতরে আর কেউ আছে বলে মনে হলো না। তবু, ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। হামাগুড়ি দিয়ে প্রথম জানালার নিচ দিয়ে সামনে বাড়লো ও। থামলো দ্বিতীয়টার নিচে এসে।

সতর্কতা অবলম্বন করায় নিজের ওপর খুশি হলো রানা। বাঙ্কহাউসের শেষ দিকে, চারটে মনিটরসহ একটা টেলিভিশন কনসোল-এর সামনে বসে রয়েছে সশস্ত্র একজন গার্ড। গোলাঘর থেকে সরাসরি বাঙ্কহাউসে আসেনি রানা, এসেছে গোলাঘরের পিছন থেকে বাঙ্কহাউসের পিছন দিকে, তা না হলে মনিটরে ওকে দেখে ফেলতো গার্ড। বাকি মনিটরগুলোয় হাসিয়েনদার সামনের গেট, গোলাঘরের মাথা থেকে চারদিকের দৃশ্য, আর বাইরের পাঁচিলের দুর্বল জায়গাগুলোর একটাকে দেখা যাচ্ছে।

একজনের পক্ষে চারটে মনিটরে চোখ রাখা সহজ কাজ নয়, অনেকক্ষণ ধরে ডিউটিতে থাকলে তার ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। রানাকে যদি লোকটা দেখেও থাকে, নিজেদের একজন লোক ভেবে সচকিত হয়নি। উজি ভরা ব্যাগটা পায়ের সাথে আটকে রেখে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে রানা।

আর আড়াই মিনিট পর জিরো আওয়ার। কাজেই সময় নষ্ট করার উপায় নেই। কর্নেল বেনিনকে নির্দিষ্ট একটা সময় জানিয়ে দিয়েছে রানা, তার আগেই বাঙ্কহাউসে পজিশন নেয়ার কথা ওর। জিরো আওয়ারের মধ্যে অবজারভেশন পোস্টটা দখল করা সম্ভব হলে কর্নেলের অ্যাসল্ট স্কোয়াড প্রায় বিনা বাধায় ঢুকতে পারবে ভেতরে।

কাজটা দ্রুত সারার ওপর নির্ভর করছে অপারেশনের সাফল্য, দেরি করলে অনেক প্রমাণ নষ্ট করে দেবে শত্রুরা।

সশস্ত্র লোকটার ওপর একটা চোখ রেখে জানালার লোহার গ্রিলে তিনটে গুলি করলো রানা। লোকটা ওর দিকে ফিরে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে দেখে চতুর্থ গুলিটা করলো তার কব্জিতে। ভাঙা গ্রিল দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ও, সাপ্রেসর থাকায় উজি তেমন কোনো শব্দই করেনি। মধ্যবর্তী খোলা দরজায় দ্বিতীয় লোকটাকে দেখা গেল, চোখে এখনো ঘুম লেগে রয়েছে। রানাকে দেখে পিছিয়ে গেল সে, পাশের চেয়ারে পড়ে থাকা কেজি-নাইনটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো। পিস্তলের আকার হলেও ওটা একটা অটোমেটিক রাইফেল। রানার দিকে তাক করতে যাবে, তারও কব্জিটা গুঁড়িয়ে দিলো উজির একটা বুলেট। প্রথম লোকটা মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাকে অনুকরণ করলো দ্বিতীয় লোকটা।

সমস্যার আংশিক সমাধান হয়েছে, কাজেই পালা করে লোক দু'-জনের মাথার পাশে লাথি মারতে হলো রানাকে অজ্ঞান করার জন্যে।

অস্ত্র দুটো সরিয়ে ফেললো রানা। লোক দু'জনকে বাঁধলো, টেনে নিয়ে এসে দু'জনকেই ঠেলে দিলো কটের নিচে। টেলিভিশন মনি-টরের কোনো ক্ষতি হয়নি, হাসিয়েনদার ওপর নজর রাখার কাজ বিশ্বস্ততার সাথে করে যাচ্ছে ওগুলো।

গার্ডের চেয়ারটা সিধে করে বসলো রানা। অ্যাসট্রে থেকে সিগা-রেট তুলে নেভালো সেটা। মনিটরে চোখ রেখে দেখলো, রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে ও গাড়িতে করে এগিয়ে আসছে পঁয়তিরিশ জন শুভানুধ্যায়ী।

খোলা একটা জীপের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কর্নেল বেনিন, ঠিক যেন জেনারেল প্যাটন।

বারো

কিছুক্ষণের জন্যে নালার পানি সাদা হয়ে গেল। প্রতিটি ব্যাগে এক কিলোগ্রাম কোকেন ক্রিস্টাল, মুখ ছিঁড়ে নালার পানিতে উপুড় করে ধরলো কর্নেলের লোকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় কয়েক মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা যেতো ওগুলো।

হাসিয়েনদার ভেতর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কেমিকেল আর কোকেন প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট পাওয়া গেল না। বিপুল পরিমাণ পেস্টও উদ্ধার করা হলো, এখনো ক্রিস্টালে পরিণত করা হয়নি। পরিশোধনে কি কি লাগে জানার পর বুঝতে পারলো রানা, কোকা পাতা থেকে পেস্ট, তারপর পেস্ট থেকে ক্রিস্টাল তৈরিতে বাধা দেয়া কেন এতো কঠিন। সাধারণ কিছু কেমিকেল হলেই চলে—পটাশিয়াম পারমাংগানেট, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, বেনজিন, অ্যাসিটোন আর ইথার।

কোকেন পেস্টই আসলে ড্রাগ ব্যবসার প্রধান উপকরণ। সবুজ কাদার মতো দেখতে, ভেজা ভেজা, সামান্য অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। সহস্তর বিশিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে কোকা পাতা থেকে পেস্ট

তৈরি করা হয়। পেস্ট শুকিয়ে নিয়ে বাসুকো হিসেবে ছাড়া হয় বাজারে। আরো পরিশোধনের পর বেরিয়ে আসে কোকেন হাইড্রো-ক্লোরাইড বা মহামূল্যবান ক্রিস্টাল।

'কি ধ্বংস করছেন সে-সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকা দরকার,' রানাকে বললেন কর্নেল। জড়ো করা ইকুইপমেন্ট আর কোকেন পেস্টের কাছে ওকে নিয়ে এলেন তিনি। তথ্য ও বিবরণ একজন বিশে-ষজ্ঞের কাছ থেকে পেলো রানা।

উৎপাদনের সাথে জড়িত পাঁচজন লোককে গ্রেফতার করা হলো। ছ'জন ছিলো ওরা, একজন কর্নেলের অ্যাসল্ট টিমের হাতে মারা পড়েছে। গার্ড ছিলো ওই দু'জনই। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ককেরস লোকটা আসলে বোকামি করে মারা পড়লো। তাকে সাবধান করা হলেও, ওদের কথা কানে তোলেনি। এক ছুটে গোলা-ঘরে গিয়ে ঢোকে সে, অচল টয়োটা পিকআপ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কর্নেলের লোকেরা জানতো না গাড়িটা অকেজো করে রেখেছে রানা, তারা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে গুলি ছোঁড়ে। পিকআপের ছাদ উড়িয়ে দেয় তারা, বডিটা চুরমার করে ফেলে। অটোমেটিক রাই-ফেলের অসংখ্য বুলেট খেয়ে গাড়ি এবং ড্রাইভার স্পেয়ার পার্টসে পরিণত হয়।

গোটা দেশ জুড়ে হাজার হাজার লোক কোকেন নিয়ে ব্যবসা করছে, সরকারী প্রশাসনও সর্বশক্তি নিয়ে লেগে আছে তাদের পিছনে, কাজেই রানা ধারণা করলো কোকেন উদ্ধারের এ-ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে কলম্বিয়ায়। কর্নেল বেনিন ওর ভুলটা ভেঙে দিলেন। যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের সবার কাছে অস্ত্র পাওয়া গেছে, নিহত লোকটার সাথেও

কেজি-নাইন ছিলো, কাজেই গার্ডের সংখ্যা মাত্র দু'জন মনে করার কোনো কারণ নেই। যদিও গার্ডের সংখ্যা তেমন কোনো তাৎপর্য বহন করে না, কার্টেলের নিরাপত্তা রহস্য অন্যখানে। হানা দেয়ার পরিকল্পনা যেখান থেকেই করা হোক, সবখানে কার্টেলের লোক আছে, আগেভাগে জেনে ফেলে তারা। হানা দিতে এসে দেখা যায় লোকজন, ইকুইপমেন্ট, পেস্ট ক্রিস্টাল, কেমিকেল, কিছুই নেই। তারপরও যদি কোকেন ধরা পড়ে, মোটা টাকার বিনিময়ে ফেরত পাবার চেষ্টা করে ওরা। ধরা পড়লো পঞ্চাশ কিলো, সরকারী খাতায় লেখা হলো পাঁচ কিলো। ককেরসরা গ্রেফতার হলো, কেস দায়ের করার আগে হাজত থেকেই তাদেরকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়। 'বলতে পারেন আজ আমি একটা অসাধ্যসাধন করেছি,' বললেন কর্নেল বেনিন। 'গত কয়েক বছরে একবারে এতো কোকেন এই প্রথমবার ধরা পড়লো। দুঃখের বিষয়, আমি কোনো প্রচার পেলাম না। প্রচার মাধ্যমগুলো উপস্থিত থাকলে গোটা কলম্বিয়ায় আজ আমি হিরো বনে যেতাম। বলা যায় না, রাজনীতিতে আমার হয়তো নতুন একটা ক্যারিয়ার তৈরি হতো।'

'আপনার উচিত ছিলো ওদেরকে খবর দিয়ে রাখা,' বললো রানা।

'বলেন কি! ওদেরকে কার্টেলের চেয়ে কম বিপজ্জনক ভাববেন না। শুধু একটু আভাস পেলেই ওরা বুঝে ফেলতো কোথায় আসছি আমরা অপারেশনে। যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এখানে আমার লাশ দেখতে পেতেন।' কর্নেলের চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'সাংবাদিক মহলে দুর্নীতি ঢুকেছে বলেই তো কলম্বিয়ার সাধারণ মানুষ জানে না দেশে কি ঘটছে।'

'বিকল্প ব্যবস্থা আছে,' শান্তভাবে বললো রানা। 'টেলিভিশনে আপনি কিছু বলতে চান? কী সেটা?'

দখল করা হাসিয়েনদার চারদিকে তাকালেন কর্নেল, যেন আশা করছেন আশপাশে কোথাও ক্যামেরাম্যান আর রিপোর্টাররা লুকিয়ে আছে। 'বলবো, আমার স্বপ্ন সত্যি হতে শুরু করেছে। কলম্বিয়াকে আমি কোকেনমুক্ত করে ছাড়বো। ব্যস, প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে দাঁড়াবার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে আমার।'

'প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি ভালো করবেন,' সহাস্যে বললো রানা। 'খবর পেলে আমি এসে আপনার পক্ষে জনমত গঠনে সাহায্য করবো।'

কিসের যেন একটা অভাব বোধ করলেন কর্নেল। বাস্তবতার, সম্ভবত। 'মিঃ রানা,' গম্ভীর স্বরে বললেন তিনি, 'আপনি এরইমধ্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কর্নেল বেনিন আপনার প্রতি ভারি কৃতজ্ঞ। কথা দিচ্ছি, সেটা আপনার কাছে নগণ্য বলে মনে হবে না।'

'বাঙ্কহাউসে এমন একটা জিনিস আছে, যেটা আপনার কাছে মনে হবে অমূল্য।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল বেনিন। 'তাই?'

'বিশ্বাস না হয়, আসুন; নিজের চোখেই দেখবেন,' বলে কর্নেলকে নিয়ে বাঙ্কহাউসে ফিরে এলো রানা। টেলিভিশন মনিটরগুলো আগেই দেখেছেন কর্নেল। এবার রানা তাকে ভিডিও ক্যামেরাটা দেখালো। 'হাসিয়েনদায় আপনি ঢুকলেন, আমিও দৃশ্যটা রেকর্ড করে রাখলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সবই ওই ক্যামেরায় বন্দী করা হয়েছে।'

'আপনি সিরিয়াস?' আনন্দে অভিভূত কর্নেলের মুখ থেকে আর কোনো শব্দ বেরোলো না।

'চারটে মনিটর, সব ক'টার প্রোগ্রাম রেকর্ড করা সম্ভব ছিলো না,'

বললো রানা। 'তবে একবার এটা, একবার ওটা থেকে রেকর্ড করেছি আমি। অপারেশনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রথম সারিতে ছিলেন আপনি, কাজেই ক্যামেরাও সব সময় আপনাকে সামনে পেয়েছে।'

বোবা হয়ে গেছেন কর্নেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন তিনি, আলতো হাত বোলালেন মনিটর স্ক্রীনে, ওগুলো যেন আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপ। ধীরে ধীরে ঘুরলেন তিনি। তারপর অকস্মাৎ, বিনা নোটিসে, ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রানাকে।

রানার কানে কানে কালভিন জানালো, 'প্রাণাধিক বন্ধুকে ছাড়া আর কাউকে উনি আলিঙ্গন করেন না।'

'আপনি দেবদূত, মিঃ রানা।'

'তা নয়, কর্নেল,' বললো রানা। 'আসলে টেপটার কোয়ালিটি খুব ভালো।'

কথাটা শোনার সাথে সাথে সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন কর্নেল। 'কিছু একটা করা যায় না?'

'ভালো একজন ফিল্ম এডিটর খুঁজে বের করুন,' বললো রানা। 'তার কাজ হবে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো রেখে বাকি সব টেপ থেকে বাদ দেয়া। সেরকম একজন লোক এখানে পাবেন বলে মনে হয়?'

'পেতেই হবে আমাকে,' বললেন কর্নেল, জানেন টেলিভিশন নেটওঅর্ক সরকার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তাঁর কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

'ফিল্মটা অবশ্য সাদা কালো,' বললো রানা।

'হ্যাঁ।' চেহারা ম্লান হয়ে গেল কর্নেলের। 'কি আর করা!'

'করার একেবারে কিছু নেই তা সত্যি নয়,' বললো রানা। 'আমি কি কোনও পরামর্শ দিতে পারি?'

'আপনাকে অনুরোধ করছি আমি,' বললেন কর্নেল। 'অনুরোধে

কাজ না হলে, নির্দেশ দিচ্ছি—তাড়াতাড়ি একটা পরামর্শ দিন।'

'এডিটরকে ফিল্মটা দিয়ে বলবেন, সে যেন ভালো একটা কপি তৈরি করে। কপিটা আপনি পাঠিয়ে দেবেন প্যাসিফিক কালার-আইজ-এ, লস অ্যাঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ায়। টেপটা প্রসেস করবে ওরা, কালো আর সাদা টোন-এ ন্যাচারাল টিন্‌ট ব্যবহার করবে। অল্প সময়ে তাক লাগানো কাজ করে ওরা। আর যদি ওদেরকে জানান যে মাসুদ রানার বন্ধু আপনি, কাজটা আরো যত্নের সাথে, আরো তাড়াতাড়ি করবে ওরা। আপনাকে কসম খেয়ে বলতেই হবে, চেহারাটা ওরা আরো ভালো করে দিয়েছে।'

'লজ অ্যাঞ্জেলস,' মুখস্থ করছেন কর্নেল। 'কালার আইজ।'

'মুখস্থ করার দরকার নেই,' বললো রানা। 'আমি লিখে দেবো সব।'

'সেটাই ভালো হবে, মিঃ রানা। মাথা যখন সম্ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সব কথা ঠিকমতো মনে থাকে না।'

'শুধু তখন, কর্নেল?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কর্নেল। 'কি চান আপনি আমার কাছে, মিঃ রানা? কি এমন জিনিস যা আপনাকে আমি দিতে পারি না?'

স্বস্তির সাথে ভাবলো রানা, যাক, শেষ পর্যন্ত কাজের কথায় ফেরা গেছে।

'হেলিকপ্টার?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন। 'খেলনার ওপর তোমার দেখছি ভারি ঝোঁক।'

'ওটা ব্যাটল-ফিল্ড টেস্টেড, এইচইউ-টোয়েনটিথ্রি,' বললো রানা। 'খেলনা নয়।'

'আদ্যিকালের পুরনো একটা ফড়িং ওটা,' বললো কালভিন। 'কি মনে করো, ঝক্কড়মার্কা একটা হেলিকপ্টার তোমাকে ভিক্টর লজেনের কাছে পৌঁছে দেবে?'

'পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে,' বললো রানা। 'পাহাড়ী এলাকা, গাড়িতে কয়েক মাইল যেতে হলে কয়েক ঘন্টা লেগে যায়। লজেনের সমান মোবিলিটি পেতে হলে আমাদের একটা হেলিকপ্টার পেতে হবে।'

'হেলিকপ্টার তুমি চালাবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন। 'দু'বার বলেছো, মাথার ব্যথাটা কমেনি। বাঁ হাতটা তো এখনো অকেজো।'

'একজন পাইলট খুঁজে নেয়া কঠিন হবে না,' বললো রানা। 'একান্ত যদি না পাওয়া যায়, এক হাতে আমিই চালাবো।'

'তারপর?' চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলো কালভিন।

'তারপর লজেনকে খুঁজে বের করবো।'

'এক হপ্তা সময় দেয়া হলো তোমাকে, আজ থেকে ধরা হবে।'

'অতো সময় লাগবে না।'

'তাহলে তো ভালোই। কর্নেলও তোমার ওপর খুশি হবেন, কারণ আজকের এই অপারেশনের পর তাঁর কোনো নিরাপত্তা নেই।'

'জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে যাবেন তিনি,' বললো রানা। 'সেটাই তাঁকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দেবে।'

'ভদ্রলোক বোকা নন,' বললো কালভিন। 'তিনি জানেন, পুরস্কার যেমন আছে, তেমনি ঝুঁকিও আছে।'

'তোমাদেরকে আমি কথা বলতে দেখেছি। তাকে তুমি কি বললে?'

'বলেছি, তুমি একটা জুয়াড়ী। আর, একজন জুয়াড়ী যখন জিতছে,

তার সাথে লেগে থাকাই সবদিক থেকে ভালো।'

'আর যখন জিতছে না?'

'তখন কি করতে হবে কর্নেলকে তা বলে দিতে হবে না।'

রানাকে আরেকটা প্রতিশ্রুতি দিলেন কর্নেল, প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করলেন। প্রধান কেমিস্টকে রানার হাতে ছেড়ে দিলেন তিনি।

লোকটাকে প্রথমবার দেখেছে রানা হাসিয়েনদায় ঢোকার পরপরই। চোখে চশমা, চেহারায় আত্মমগ্ন একটা ভাব। আলোচনায় ভালো ফল না পাওয়া পর্যন্ত লোকটাকে কোথাও পাঠানো হবে না।

কর্নেলের লোকজন আগেই তাকে মারধর করেছে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারায় কপালের ওপর ফুলে আছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। চশমাটাও অক্ষত নেই। পঞ্চান্ন গ্যালন ঈথার ভরা একটা ড্রামের ওপর বসানো হয়েছে তাকে, ড্রামের সাথে হাত-পা বেঁধে।

স্মোকহাউসের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেলের দু'জন লোক। ইন্টারোগেশনে কি ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করছে তারা। একজনের ধারণা, ড্রামটা পানিতে ফেলে দেয়া হবে, নালায় পানি যেখানে সবচেয়ে গভীর। ড্রামের কোন্ দিকটা ডোবে, কোন্ দিকটা ভাসে দেখার জন্যে আগ্রহ-প্রকাশ করলো সে। দ্বিতীয়জন বললো, তার খুব মজা লাগবে ড্রামটা যদি শুকনো, ঢালু নালা দিয়ে গড়াতে শুরু করে।

'তোমরা যাও তো,' নির্দেশ দিলো রানা। 'টেকনিশিয়ানের সাথে কথা বলতে দাও আমাকে।'

সাথে সাথে সরে গেল লোক দু'জন, তবে খুব বেশি দূরে নয়। ওই দূরে তাদের সাথে অন্য কেউ কথা বললে উত্তরে হয়তো গুলিই করে

বসতো, কিন্তু রানা কি করেছে জানে তারা, ওর প্রতিটি আচরণের প্রতি মৌন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে সবাই।

'তুমি প্রধান পাচক,' ব্যারেলের সাথে বাঁধা লোকটাকে বললো রানা। 'চীফ কেমিস্ট।'

কথা বললো না লোকটা। বাক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে কিনা বোঝা গেল না, তবে অন্তত একটা শারীরিক নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে হারিয়েছে। তার খাকি শর্টস ভিজে গেছে, গন্ধটা চেনা গেল।

'তোমার নাম কি ?'

এবারও কথা বললো না লোকটা। পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আরো সামনে চলে এলো রানা। লোকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো ও, কাস্তে আকৃতির রেঞ্চ দিয়ে ব্যারেলের মাথায় বসানো ছিপিটা ঢিলে করলো। এক কাপের মতো ঈথার পড়লো মাটিতে, মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। ছিপিটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলো রানা, শুকনো মাটি তরল ঈথার শুষেও নিলো এক নিমেষে, তারপরও বাষ্প-টুকু রয়ে গেল বাতাসে। একজন কেমিস্ট হিসেবে লোকটা খুব ভালো করেই জানে যে বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র বাষ্পে পরিণত হয় ঈথার, সেই সাথে ওটা একটা বিপজ্জনক বিস্ফোরক পদার্থও বটে।

সিধে হলো রানা, ঘুরলো, ধীর পায়ে হেঁটে এলো কর্নেলের লোক দু'জনের কাছে। নরম সুরে একটা সিগারেট চাইলো ও। তাড়াতাড়ি সিগারেট বাড়িয়ে দিলো দু'জনেই, রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হাসছে। রানা সিগারেটটা ধরাতে কয়েক পা দ্রুত পিছিয়ে গেল তারা। ধীর পায়ে ঈথার ভরা ব্যারেল আর ওটার ওপর বসা বন্দীর দিকে এগোলো রানা।

লোকটার কাছ থেকে বারো ফুট দূরে দাঁড়ালো ও, লোকটা মুখ

খোলে কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার এগোলো। ড্রামের সামনে এসে দাঁড়ালো ও। কেমিস্টের হাত দুটো কোলের ওপর পড়ে আছে, কব্জির নিচে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত পেঁচানো হয়েছে রশি, ফলে আঙুলগুলো পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে। কথা না বলে দুই আঙুলের মাঝখানে জ্বলন্ত সিগারেটটা ঢুকিয়ে দিলো রানা। ডি. এ. এস. ট্রুপার দু'জন আরো কয়েক পা পিছিয়ে গেল। পিছিয়ে এলো রানাও। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

'জুয়ান ভিলা।'

'তোমার ঠিকানা আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের নাম বলো।'

'তার কোনো দরকার হবে না, সিনর।'

'বেশ,' বললো রানা। 'তাহলে বলো ভিক্টর লজেনকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

ব্যাকুলদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালো কেমিস্ট, গলা চড়িয়ে বললো, 'সিনর, এমন প্রশ্ন করুন যার উত্তর দিতে পারবো আমি। ঈশ্বরের দোহাই, ঈথার অত্যন্ত ভয়ংকর জিনিস।'

'চেইনের পরবর্তী লিঙ্ক কে, ভিলা? লজেনের নিচের লোকটা?'

সিগারেটের গরম ধোঁয়া ভিলার আঙুলে ছাঁকা দিচ্ছে। শারীরিক কোনো ব্যথা এখনো অনুভব করছে না, তবে খানিক পরই সরাসরি আগুনের ছ্যাঁকা খাবে। তখন কি ঘটবে? 'আমি আপনাকে জানাতে পারি কোথায় কোকা পাতা চাষ হয়। আপনি চাইলে কোকা পাতার গুদামগুলো দেখাতে পারি।'

'কোকা ঝোপ খুঁজতে আসিনি আমি,' বললো রানা। 'কোকা চাষীদের খবর জেনে আমার কোনো কাজ হবে না। কোথায় পেস্ট

তৈরি হয় তাও আমার জানার দরকার নেই। এ-সব তুমি জানো, ভিলা।'

'প্লিজ, সিনর। দয়া করে আমার পরিবারের কথা বিবেচনা করুন।'

'তোমার পেশায় ঈথার নিশ্চয়ই একটা হাতিয়ার,' বললো রানা, যেন গুরুত্বহীন বিষয়ে হঠাৎ আগ্রহ জেগেছে ওর মনে। 'দুর্ঘটনার সাহায্যে কতোজন লোককে তাদের পরিবার থেকে চিরতরে সরিয়েছো তুমি ?'

চোখ নামিয়ে সিগারেটটার দিকে আবার তাকালো জুয়ান ভিলা। দু'আঙুলের মাঝখানে নেমে যাচ্ছে আগুন। ছাইটা লম্বা হয়ে রয়েছে, অটুট।

'তাড়াতাড়ি বলো, ভিলা,' তাগাদা দিলো রানা। 'বাস্কো বা ক্রিস্টাল কোথায় ডেলিভারি দেয়া হয় ?'

'অ্যারোভিয়াস-এ,' বললো জুয়ান ভিলা।

ওটা ভিক্টর লজেনের এয়ারলাইন। 'কার নামে পাঠানো হয় ?'

'পাইলটের নামে,' বললো ভিলা। 'সিনর গর্ডন উইন্টারের কাছে।'

'গর্ডন ? কে লোকটা ? আমেরিকান নাকি ?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকালো জুয়ান ভিলা। 'হ্যাঁ, সিনর,' বললো সে। 'আপনার বন্ধুর মতো।'

তেরো

'গর্ডন উইন্টারের কথা দুনিয়ার মানুষকে জানানো দরকার,' বললো কালভিন। 'অল্প যে-দু'চারজন আমেরিকান সরাসরি কার্টেলের পক্ষে কাজ করে, তাদের একজন সে। গত দশ বছর ধরে দক্ষিণ আর মধ্য আমেরিকায় প্লেনে করে ড্রাগ নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠলে গা-ঢাকা দেয়। দু'বছর আগের কথা জানি, সরকারী পেনশন নিয়ে কোস্টারিকায় বসবাস করছিল।'

'পেনশন?'

'কোস্টারিকান সরকারের কোনো অফিসারকে দু'লাখ ডলার ঘুষ দাও, সে তোমাকে সরকারী চাকরি থেকে শুরু করে পেনশন পর্যন্ত সবই ম্যানেজ করে দেবে। ক্রিমিনাল আর ড্রাগ ট্রাফিকারদের জন্যে এটা তাদের বিশেষ সেবা। অপরাধীরা আইনসিদ্ধ একটা মর্যাদা পায়, দেশটা মুখ দেখে বিদেশী মুদ্রার।'

ল্যাটিন আমেরিকায় অনেক দেশই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করে নিচ্ছে, জানতে পারলো রানা। অনেক সরকারই ড্রাগ ব্যবসার অনুকূলে, গোপনে সহায়তা করে

যাচ্ছে। 'তোমরা কখনো গর্ডনের নাগাল পাবার চেষ্টা করোনি?'

'সে-সময় তার বিরুদ্ধে আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ ছিলো না,' বললো কালভিন। 'একজন আমেরিকানের গল্প শুনতাম আমরা, লোকটা কলম্বিয়ানদের সাথে হাত মিলিয়েছে। অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা। গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে শুধু নিজেদের লোককে বিশ্বাস করে ওরা। অথচ ওদের হয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছে গর্ডন।'

'যেমন?'

'যেমন—উনিশশো একাশি সালে কার্টেল সদস্যদের একটা শীর্ষ সম্মেলন ডাকলো ওকহোয়াস, রাঘব-বোয়ালদের বয়ে নিয়ে গেল পাইলট গর্ডন উইন্টার। এর মানে হলো, তাকে ওরা বিশ্বাস করে। গত বছরের ঘটনা, বিপুল পরিমাণ কোকেন পাঠাবার দরকার হলো মেক্সিকোয়, দায়িত্বটা দেয়া হলো গর্ডনকে। আমরা জানতাম, কারণ প্লেনে আমাদের লোক ছিলো। সেবার গর্ডনকে আমরা হাতের মুঠোয় পাই। কিন্তু প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে আমাদেরকে কাঁচকলা দেখালো সে। কুইনটানা রো-র এয়ারস্ট্রিপে প্লেনটাকে বিধ্বস্ত করলো সে, প্লেনের সাথে সমস্ত সাক্ষী-প্রমাণ পুড়ে গেল। বন্ধু গর্ডনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাঠানো হলো হাসপাতালে।'

'এখন সে বাইরে রয়েছে, টমাস।'

'ইমার্জেন্সী থেকে বেরোনো বা ইমার্জেন্সীতে ঢোকা তার কোনো ব্যাপারই নয়,' বললো কালভিন। 'ভিয়েতনামে হেলিকপ্টার চালিয়েছে সে। একজোড়া পার্পল হার্ট পদক পেয়েছে। থাইল্যাণ্ডে প্লেন চালিয়েছে। আফ্রিকা আর সেন্ট্রাল আমেরিকায় মার্সেনারিদের বয়ে নিয়ে গেছে। ওয়েদার হেলিকপ্টার চালাবার অভিজ্ঞতাও আছে তার।'

‘ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে,’ বললো রানা।

‘সেটা পরিষ্কার, রানা। বোধহয় সেজন্যে কার্টেল তাকে এতোটা পছন্দ করে।’

‘লজেন তাকে পছন্দ করে।’

‘মনে হয়।’

‘কাউকে পছন্দ করতে হলে তাকে তোমার ভালো করে চিনতে হবে।’

‘সবক্ষেত্রে কথাটা সত্যি নাও হতে পারে, রানা।’

‘আমার ধারণা, বিলাসবহুল জীবনের প্রতি লোভ আছে গর্ডনের,’ বললো রানা। ‘এবং সে নিজেও বোধহয় কোকেন ব্যবহার করে।’

‘আমাদেরও সেরকম ধারণা।’

‘লজেনের মতো,’ বললো রানা। ‘আমরা বোধহয় এই লোককেই খুঁজছি, টমাস।’

‘হতে পারে।’

‘গর্ডন একজন পাইলট, ভিক্টর লজেনকে ভালোভাবে চেনে, কাজেই সে আমাদেরকে কোকেন সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবে।’

‘তাকে আমরা বাধ্য করবো, এইতো?’

গর্ডনকে ধরতে হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। কালি র‍্যাঞ্চে হানা দেয়ার খবর কার্টেলের কাছে পৌঁছে যাবে, সান্ধ্য দৈনিকে কর্নেল বেনিনের সাফল্যের কাহিনী ছাপা হওয়ার আগেই। গর্ডন কাছাকাছি একটা প্লেনে পৌঁছুনোর আগেই তার কাছে পৌঁছুতে হবে ওদের।

সিগারেটের আগুনে জুয়ান ভিলার শুধু আঙুল পুড়েছে। তার কাছ থেকে জানা গেল, পুরোপুরি প্যাকিং করা অবস্থায় অ্যারোভিয়াস অফিসে

ডেলিভারি দেয়া হয় কোকেন। ছ'টা প্লেন নিয়ে ওটা একটা বৈধ এয়ারলাইন। ছ'টার মধ্যে দুটো সব সময় কালিতে থাকে, জরুরী পরিস্থিতির জন্যে একটাকে সব সময় তৈরি অবস্থায় রাখা হয়। সারা দেশ জুড়ে নেটওঅর্ক আছে আরোভিয়াসের, তবে কোকেন নিয়ে সাধারণত বন্দর শহর বারাকুইলা আর কার্টেজেনা-য় যায়। ওখান থেকে জাহাজে তোলা হয় কার্গো। জাহাজগুলোর গন্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানে না জুয়ান ভিলা।

অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে চলাচল করে বলে বাণিজ্যিক শিপমেন্টের ওপর সত্যিকার কোনো নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয় না। লেদার গুডস লেখা বাক্সের ভেতর থাকে কোকেন, কাউকা উপত্যকা থেকে পাঠানো অন্যান্য পণ্যও এ-ধরনের বাক্সে ভরা হয়। কালি র‍্যাঞ্চের স্মোকহাউসে চামড়াজাত পণ্যের কোনো অভাব নেই—হাতব্যাগ, ফুটবল, ব্রিফকেস থেকে শুরু করে জুতো পর্যন্ত সবই আছে। একটা বিশাল দোচালার ভেতর অসংখ্য বাক্সও পাওয়া গেছে, কার্ডবোর্ডের তৈরি।

কি করতে হবে দ্রুত চিন্তা করে নিলো রানা। স্মোক হাউসের কিছু জিনিস-পত্র বাক্সে ভরার নির্দেশ দিলো ও, বাক্সগুলো তোলা হলো মিতসুবিশি ভ্যানে। সামনের সীটে জুয়ান ভিলাকে বসালো, তার পাশে বসলো কর্নেলের একজন লোক, পুলিশের ইউনিফর্ম পরে। ভ্যানের গায়ে মিলিওনারিয়স-এর লোগো আঁকা রয়েছে, ইনট্রা-কলম্বিয়ান লীগে অংশগ্রহণরত একটা ফুটবল টিমের প্রতীকচিহ্ন ওটা পাতানো খেলার একটা টিকেট বিনা পয়সায় পাবার ইচ্ছে না হলে কোনো পুলিশ ভ্যানটাকে থামাবে না।

ধরা যাক, মধ্য কালিতে, কেসোদো পার্ক থেকে বেশি দূরে নয়, অ্যারোভিয়াস অফিসের কাছাকাছি থামানো হলো ভ্যানটাকে। ফ্রি

পাস পাবার ইচ্ছে রয়েছে পুলিশ লোকটার, কিন্তু ভ্যানের ভেতর খেলার সরঞ্জাম না দেখে অস্বস্তিবোধ করবে সে। চামড়াজাত খেলার সামগ্রীর বদলে সে দেখতে পাবে অনেকগুলো প্লাস্টিক ব্যাগে কোকেন রয়েছে।

যে কোনো দেশে একজন টহল পুলিশের কাছে পরিস্থিতিটা দুটো সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হবে : ভালো কাজের জন্যে ডিপার্টমেন্টের প্রশংসা, কিংবা মোটা টাকা পুরস্কার। প্রথম সম্ভাবনাটা নিয়ে কলম্বিয়ার খুব কম পুলিশই মাথা ঘামায়, অবশ্য তার যদি আত্মহত্যা করার শখ চাপে তাহলে আলাদা কথা। কলম্বিয়ায় ঘুষ এমন একটা জিনিস, খাওয়ার জন্যে নরম সুরে অনুরোধ করা হয়, সবিনয়ে সাধা হয়, কিন্তু না খেলে গুলি করে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। ঘুষ প্রত্যাখ্যান করেছে এমন একজন লোক পরবর্তী হপ্তা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, সে-সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

'প্ল্যানটা কিন্তু ঝুঁকিবহুল,' বললো কালভিন, হাইওয়ে ছেড়ে অ্যাভেনিডা টেরেস-এ চলে এলো গাড়ি, শহরের মাঝখানে। 'হয় গর্ডন চেহারাই দেখাবে না, নয়তো কালির গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে হাজির হবে।'

'ভুল করছো, টমাস। শুধু যদি দেখার জন্যেও হয়, ওখানে থাকবে সে।'

'আমিও সেজন্যে যাচ্ছি, দেখতে,' বললো কালভিন। 'রাস্তায় কাটা মাথা গড়াগড়ি খাচ্ছে, জীবনে কখনো দৃশ্যটা চাক্ষুষ করিনি। শহরের মাঝখানে, শপিং এলাকায়, তুমি যদি গোলাগুলি শুরু করো, আমার অনেক দিনের সাধটা পূরণ হয়।'

রানা ভেবেছে ঝুঁকিটা নেয়া যেতে পারে। কালি শহরের হৃৎপিণ্ডে, রোববার বিকেলে, প্রতিপক্ষ ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ

পারে বলে মনে হয় না। স্থানীয় খুনিরা ঐতিহ্য বজায় রেখে গির্জায় গিয়েছিল, সবেমাত্র ফিরেছে তারা। দিনের বাকিটা সময় যার যার পরিবারের সাথে কাটাবে তারা, অবসর সময়টা ব্যয় করবে আগামী হপ্তার অপরাধ কর্মসূচীর পরিকল্পনা রচনায়। ল্যাটিন আমেরিকায় রোববার বিকেলের চেয়ে পবিত্র ও ধীরগতি ব্যাপার খুব কমই আছে। আগেই খবর নিয়েছে রানা, অ্যারোভিয়াস এয়ারলাইনের কোনো ফ্লাইট আজ নেই।

চৌরাস্তায় পৌছে অ্যারোভিয়াস অফিসে ফোন করা হলো। নিজের দায়িত্ব পালন করলো জুয়ান ভিলা, জরুরী সুরে বারবার তাগাদা দিলো, সিনর গর্ডন উইন্টারকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ তাকে জানালো, সে যেন ঠিক জায়গামতো অপেক্ষা করে। উৎসাহ বোধ করলো ওরা।

কর্নেল বেনিনও রানার প্ল্যানটা পুরোপুরি পছন্দ করতে পারেননি, যদিও দুটো ঘোড়ার কোনোটাই ছাড়তে রাজি হননি তিনি। একটার ওপর বাজি ধরেছেন, অপরটার ওপর সওয়ার হয়েছেন। দৃশ্যটা কাভার দেয়ার জন্যে চারজন অতিরিক্ত লোককে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর দলের সেরা চারজনকে।

পার্কের উত্তর পেরিমিটারের চারধারে পজিশন নিলো ডি. এ. এস. এর লোকগুলো। নিজেদের কাজে দক্ষ তারা। দু'জন ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড চেক করতে শুরু করলো, পালা করে ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করছে উপতাকার বাইরে একটা জায়গায় তারা ভাড়া যাবে কিনা। হ্যাঁ, জায়গাটা দূরে। না, প্রচলিত হারে ভাড়া দেয়ার সামর্থ্যও তাদের নেই। কিন্তু...।

বাকি দু'জন বেঞ্চে বসে দুই বুড়োর দাবা খেলা দেখছে। মাঝে মধ্যে চাল বলে দেয়ার চেষ্টা করলো তারা। পছন্দ হলে বাদামওয়ালা-

কে ডাকলো বুড়োরা, পছন্দ না হলে বাপ-মা তুলে গাল দিলো।

মিতসুবিশি ভ্যানের নাক বরাবর সামনে, রাস্তার ওপর পাতা টিনটো বার-এর দিকে হেঁটে এলো রানা আর কালভিন। ইচ্ছে না থাকলেও কফি খেতে হবে ওদেরকে।

'এখনো আমার ধারণা, সে আসবে।'

'কফির দামটা ফেরত দিয়ো আমাকে,' বাজি ধরে বললো কালভিন।

কালভিনের হাতে একটা চুরুট গুঁজে দিলো রানা। 'তুমি ফেরত দিয়ো চুরুটের দাম।'

'তুমি জিতে যেতে পারো মাত্র একটা কারণে, লড়াকু ষাঁড়ের মতো পাগলাটে গর্ডন। তার সম্পর্কে প্রথম যে রিপোর্টটা পাই আমরা, ইউকাতান থেকে, তাতেই লোকটার পরিচয় ফুটে ওঠে। খবর এলো, বীচক্রাফট নিয়ে এক উন্মাদ পেনিনসূলায় আসা-যাওয়া করছে, তার কাজ হলো জানালা দিয়ে ফুটবল ছোঁড়া। ফুটবলগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, ভেতরে আশ্চর্য উন্নতমানের কোকেন ক্রিস্টাল। আর সমস্যা হলো, এয়ারক্রাফট থেকে মাটিতে পড়লে ওগুলোর বেশিরভাগই ফেটে যায়। শহরতলীর অর্ধেক মাঠ সাদা হয়ে গেল।'

'ফুটবল, অ্যাঁ?'

'ঠিক ধরেছো, মিলিওনারিয়স ক্লাবের ছাপ মারা ছিলো ওগুলোয়,' বললো কালভিন।

'লা ব্লাংকার বয়ফ্রেণ্ড ওদের হয়ে খেলতো, তাই না?'

'তাকে জেরা করার সুযোগ পেলে ভালো হতো, রানা। ছেনি দিয়ে চেঁছে তুলে আনতে পারতাম কার্টেলের গা থেকে।'

'প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে হোয়াইট লেডিকে দায়ী করতে পারো তুমি। তবে দুঃখ করো না, তার বদলে গর্ডনকে পাচ্ছো।'

'তাকে আমরা পাচ্ছি, নাকি সে আমাদেরকে পাচ্ছে, বলা কঠিন। ইট বেরিয়ে থাকা দেয়ালের সাথে কথা বললে, এমনকি কলম্বিয়াতেও ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগবে মানুষের।'

চারদিকে তাকিয়ে শুধু চার্চের সামনের দেয়ালে ইট বেরিয়ে থাকতে দেখলো রানা। চৌরাস্তার চারপাশের লম্বা বিল্ডিংগুলোর তুলনায় চার্চটাকে বেঁটে আর বাতিল বলে মনে হলো। একবার চোখ বোলালেই বোঝা যায়, মেডিলিনের মতো কালিতেও নারকো ডলারের আগমন ঘটেছে। বিল্ডিংগুলো নতুন ও আধুনিক।

বিকেলের রোদে ফেরিওয়ালা যে ক'জনকে দেখা গেল তারা ফেরিওয়ালাই, ছদ্মবেশী চর নয়। একজন বাদাম ফেরি করছে, স্যুভেনির বিক্রি করছে দু'জন, লোহার শিকে গেঁথে আগুনে ঝলসানো কলিজা বিক্রি করছে একজন, টিনের বাক্স নিয়ে জুতো পালিশ করছে এক কিশোর, সমবয়েসী আরেক ছেলে কমলা বেচছে। ছয় কি আটজন ট্যুরিস্টকে ঘিরে আছে তারা, ট্যুরিস্টরা এসেছে কালির বিখ্যাত সুন্দরীদের দেখতে, কিংবা বাবারবউদের সন্ধানে। আধাবয়েসী দশ কি বারোজন কালিবাসীকে এড়িয়ে যাচ্ছে ফেরিওয়ালারা, তারাও সম্ভবত ওই একই উদ্দেশ্যে রাস্তায় ঘুর ঘুর করছে।

দুঃসাহসীরা পৌঁছুনোর সাথে সাথে টের পেয়ে গেল রানা, তবে তাদের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলো না। আটজনকে নিঃসন্দেহে চিনতে পারলো ও, বাকি দু'জনকে সন্দেহ করলো। লোকগুলো যে দ্রুত এলো তা নয়, এলো একটা ছক ধরে। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চৌরাস্তায় ঢুকলো তারা, সবাই এগোলো মিতসুবিশি ভ্যানের দিকে। প্রত্যেকের বেল্টের ওপর ঢিলেভাবে ঝুলছে শার্ট বা জ্যাকেট।

'ভাগাভাগির সময়, টমাস,' বললো রানা।

'বাঁ দিকের দু'জন আমার,' বললো কালভিন। ক্যারেরা ফাইভ পেরোচ্ছে তারা, তার দিকে পিছন ফিরে। ইচ্ছে করলেই তাদেরকে ফেলে দিতে পারে সে। দু'জনই চওড়া, ভারি ; সাথে যোগ হয়েছে অস্ত্রের ওজন, চাইলেও তারা ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে পারবে না। আর কালভিন স্মল আর্মস-এ বিশেষ দক্ষ, রানার জানামতে শ্রেষ্ঠ মার্কসম্যানদের অন্যতম।

যতোদূর বোঝা যাচ্ছে, বাজিটা কালভিনই জিতবে, কারণ এখনো কোথাও গর্ডন উইন্টারকে দেখা যাচ্ছে না। তার অনুপস্থিতি বিকট একটা সমস্যা তৈরি করতে যাচ্ছে। কালভিনের শিকার দু'জন ভ্যানের পনেরো গজের মধ্যে রয়েছে, চৌরাস্তার মাথায়, মই বেয়ে উঠে পড়েছে ক্রসওয়াক-এ, ওপর থেকে কোণাকোণিভাবে লক্ষ্য রাখছে টার্গেটের ওপর। আরো দু'জন ঢুকে পড়লো ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের পিছনে, অবশ্য সাথে সাথে ধরা পড়ে গেল ডি. এ. এস. এজেন্টদের চোখে। চারজনের শেষ দলটা, পার্ক ঘিরে থাকা চওড়া ফুটপাত ধরে আসছে, হঠাৎ তাদের হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো।

রানাকে এবার জায়গা বদল করতে হলো। ডি. এ. এস.-এর যে দু'জন লোক দাবা খেলা দেখছিল, নিজেদের বিপদ টের পেয়ে ছড়িয়ে পড়লো তারা। একজন গা ঢাকা দিলো মোটা পাম গাছের আড়ালে। অপর লোকটা দুই বুড়োকে ভাগিয়ে দিয়ে পাথুরে বেঞ্চের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসলো, বেঞ্চের ব্যাকরেস্ট-এ পিস্তল ধরা হাতটা ঠেকিয়ে অপেক্ষায় থাকলো।

ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে, ভাবলো রানা। রোদ ঝলমলে বিকেলে একটা শহরের প্রধান চৌরাস্তাকে রণক্ষেত্র হিসেবে কল্পনা করা কঠিন, তবে পুনরাবৃত্তি ঘটায় এ-ধরনের ব্যাপারগুলোয় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে মন।

প্রায় তিন হপ্তা আগেই উপলব্ধি করেছে রানা, দেয়ালগুলো যখন ওর ওপর ছিটকে পড়ছিল। গোটা কলম্বিয়াই আসলে যুদ্ধক্ষেত্র। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো ও, ভাগ্য ভালো যে, আজ ছুটির দিন।

রাস্তা পেরোলো রানা। পার্ক করা সার সার গাড়িগুলো গোটা চৌরাস্তাকে বেড় দিয়ে রেখেছে, দু'সারি গাড়ির মাঝখানে ঢুকে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করলো ও। হীরক আকৃতি ফুটপাতে উঠলো, মিতসুবিশি ভ্যান থেকে পনেরো ফুট দূরে। ঠিক তখুনি উদয় হলো গর্ডন উইন্টারও।

অকস্মাৎ একটা গাঢ় লাল টাউন কার কালি ইলেভেন থেকে বাঁক ঘুরে ঢুকে পড়লো চৌরাস্তায়, সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে। ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মিতসুবিশি ভ্যান আর পাশের গাড়িটা আড়ালে পড়ে গেল। টাউন কারের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো লাল চুল আর লম্বা গলা। লোকটাকে দেখার আগেই রানা আন্দাজ করে নিয়েছে, হয় গর্ডন বা হোমরা-চোমরা কেউ পৌছুলো, কারণ টাউন কারকে দেখামাত্র গোটা চৌরাস্তার সমস্ত নড়াচড়া থেমে গেছে।

চৌরাস্তার মাঝখানে রয়েছে দুঃসাহসীদের চারজন, ব্যস্ততার সাথে রাস্তার পাশে সরে গেল তারা, ভ্যান থেকে বিশ গজ দূরে। হাঁটু গেড়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিলো তারা। পশ্চিম দিকে ভ্যানের আরো কাছাকাছি রয়েছে কালভিনের দুই শিকার, তাদের পিছু নিয়ে চমৎকার একটা পজিশনে রয়েছে সে। বাকি দু'জন উত্তর প্রান্তের ফুটপাত আর বাগানের মাঝখানে রয়েছে। ব্যাপারটা শুরু হলে অংশগ্রহণ করার শখ একজনেরও অপূর্ণ থাকবে না।

গর্ডন উইন্টার দ্রুত নেমে এলো। দেখতে তেমন কিছু নয় সে।

একহারা, খুব বেশি লম্বা নয়, মাথায় সামান্য টাক। মুখে এতো বেশি খয়েরি তিল যে চেহারাটা বিকৃতই বলা যায়। হাঁটার ভঙ্গিটা ঋজু। ভ্যানের কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো সে, কারণ রানাকে এতো-ক্ষণে দেখতে পেয়েছে। রানাকে দেখেই সে বুঝতে পারলো, লোকটা ইচ্ছে করেই এখানে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে ভ্যানের কাছাকাছি পৌঁছুলে দেখা হয় দু'জনের।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো গর্ডন উইন্টার।

'তোমার মৃত্যু, গর্ডন।'

রানার হাতে পিস্তলটা দেখলো গর্ডন। গোটা চৌরাস্তার ওপর দ্রুত একবার চোখ বোলালো সে। 'আশপাশটা তোমার দেখা আছে তো, বন্ধু?'

'তোমার সব ক'জন লোকই টার্গেট হয়ে আছে,' বললো রানা। 'তুমি আমার, গর্ডন।'

'জানি না কোন্ জাহান্নাম থেকে এসেছো তুমি,' শান্তসুরে বললো গর্ডন, তিলবহুল মুখে ভাঁজ তুলে হাসলো সে। 'সম্ভবত আমার সাথে তোমার কোনো জরুরী আলাপ আছে।' কথাটা বলার সময় রানার বুক লক্ষ্য করে তর্জনী তাক করলো সে।

ল্যাটিন আমেরিকায় কেউ সাধারণত কারো দিকে আঙুল তোলে না, ব্যাপারটাকে অপমানকর ও অশালীন বলে মনে করা হয়। আঙুলটা ওর দিকে খাড়া হতে যাচ্ছে দেখেই ডাইভ দিয়ে রাস্তার ওপর পড়লো রানা।

প্রথম সুযোগেই পাইলটকে গুলি করতে পারতো রানা। করলো না, কারণ লোকটাকে অক্ষত অবস্থায় দরকার ওর। বাকি দুঃসাহসীরা মরলেই বরং ভালো। মাটিতে পড়লো রানা গুলি করতে করতে।

টাউন কারের ড্রাইভার তিনটে গুলি খেলো। একটা মাথায়, একটা বুকে, শেষটা মেশিন-পিস্তল ধরা হাতের কনুইয়ে। ড্রাইভার মারা পড়লেও, গর্ডন ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে। লোকটা পালাচ্ছে দেখেও কিছু করতে পারলো না রানা। চারদিক থেকে গুলি করা হচ্ছে ওকে লক্ষ্য করে।

রানা একা নয়, সশস্ত্র সবগুলো লোক টার্গেটে পরিণত হলো। কেজি-নাইন বেরিয়ে এলো জ্যাকেটের তলা থেকে, কোমরের বেল্ট থেকে বেরোলো রিভলভার। গোটা চৌরাস্তা জুড়ে লোকজন চিৎকার আর কান্নাকাটি করছে। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে একটা পাথুরে বেঞ্চের পিছনে চলে এলো রানা, পিস্তলের মাজল তাক করলো নিঃসঙ্গ এক ককেরসের দিকে। ওয়েস্টার্ন সিনেমার অজেয় নায়কের মতো লোকটা, দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে ঠেকে আছে অটোমেটিক রাইফেল, মুখে বেপরোয়া হাসি। পাথুরে বেঞ্চে লাগলো তার গুলি, উল্টে দিলো পাশের একটা ডাস্টবিন, খানিকটা আবর্জনা ছিটকে পড়লো রানার মুখে।

ওভাবেই মারা গেল লোকটা, মুখে বেপরোয়া হাসি নিয়ে, বুকে গুলি খাবার সময় ট্রিগার টিপছে, এক দিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাচ্ছে রাইফেলটা, ভেঙে চুরমার করছে জানালার কাঁচ, টুকরো টুকরো করছে পাম গাছের পাতা।

আরেকজন ককেরসকে গুলি করতে যাচ্ছিলো রানা, তার হালকা নীল শার্টে স্থির হলো সাইট, কিন্তু পিস্তল থেকে গুলি বেরোবার আগেই ধরাশায়ী হলো টার্গেট। ডি. এ. এস.-এর যে লোকটা লক্ষ্যভেদ করেছে তাকে দেখতে পেলো রানা। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে পাম গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে, সাথে সাথে নিজেও গুলি খেলো।

এমন ভঙ্গিতে পড়লো লোকটা, ঠিক যেন বরফে পা পিছলে গেছে। মুখটা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লো, হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত, এই সময় দ্বিতীয়বার গুলি খেলো বেচারা।

গুলি করতে করতে সিধে হচ্ছে রানা, আরো কয়েকটা দৃশ্য চোখে পড়লো ওর। দেরি না করে গর্ডনের পিছু নিয়ে ছুটলো ও। জুতো পালিশ করার বাক্সের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কিশোর ছেলেটা, মুখ হাঁ করে চিৎকার করছে, যদিও কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না গলা থেকে। এক মহিলা কাঁদছে, গুলি খেয়েছে বলে মনে হলো না। কাল-ভিনের কোল্ট এখনো বিকট শব্দ করছে। অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন আগের চেয়ে অনেক কমেছে। গুলির কিছু শব্দ যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। টাউন কারের ড্রাইভার মারা গেলেও, লাশের ধাক্কা খেয়ে দরজাটা খুলে গেছে, বাইরে বেরিয়ে এসেছে রক্তাক্ত মাথা।

চুল ধরে লাশটা টেনে আনলো রানা, ফেলে দিলো নর্দমায়। ইগনি-শনেই পাওয়া গেল চাবিটা। সহজেই স্টার্ট নিলো এঞ্জিন। গাড়িটা এতো বড় যে ঘোরাতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। তবে সিধে হবার পর দ্রুতবেগে ছুটলো।

সামনে গর্ডনকে দেখা যাচ্ছে না। রানা তাকে উত্তর দিকে যেতে দেখেছে, এভারলিফট বিজ্ঞাপনটা ছাড়িয়ে পাশের রাস্তায় উঠেছে সে এই মুহূর্তে ওখানেও নেই সে। বাম কিংবা ডান, দুটোর যে-কোনো একটা বেছে নিতে হবে রানাকে। বাঁ দিকেই গাড়ি ঘোরালো ও, অ্যারোভিয়াসের অফিসটা ওদিকেই।

রাস্তাটা ওয়ান-ওয়ে, টাউন কার উল্টোদিকে ছুটছে। ছোটো একটা ফিয়াটের ড্রাইভার আঁতকে উঠে ফুটপাতের ওপর তুলে দিলো গাড়িটা। ভাগ্য ভালো যে ছুটির দিন বলে শহরের মাঝখানে যানবাহনের ভিড়

নেই। রাস্তার শেষ মাথায় খর্বকায় একটা লালচুলো মূর্তিকে দেখা গেল, বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মোড়ে পৌঁছুনোর আগেই সজোরে ব্রেক কষলো রানা, ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে আনলো গাড়িটাকে, তারপর হুইল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লো সাইড রোডে।

গর্ডন উইন্টার ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই, ভাবলো রানা। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই আরেকটা গাড়ি রাখা আছে তার। কিংবা সে হয়তো কোনো সেফ হাউসের দিকে যাচ্ছে। আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিলো রানার মনে, ওর হাতে ধরা পড়ার আগে গর্ডন না আবার প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যায়।

আত্মরক্ষায় দক্ষ লোক গর্ডন, ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে আজও বেঁচে আছে সে। রাস্তা পেরোবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকালো সে, দেখলো টাউন কারটা পিছু নিয়েছে। স্যাৎ করে একটা গলির ভেতর গা-ঢাকা দিলো সে।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে গর্ডন, অ্যারোভিয়াস অফিসে ঢুকে পড়েছে।

সাইড রোড থেকে বেরিয়ে এসেই তাকে দেখতে পেলো রানা। অ্যারোভিয়াস অফিসে অস্ত্র থাকতে পারে, থাকতে পারে ব্যাকআপ টিম, পালাবার গোপন পথ, ম্যান-ট্র্যাপ। ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, জানে কাজটা ঝুঁকিবহুল, তবু বাতিল করলো না। রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়, সামনের চৌরাস্তাটাও বিশাল নয়, বাঁক নিতে হলে এখুনি টাউন কারের স্পীড কমানো দরকার। তা না করে, স্পীড আরো বাড়িয়ে দিলো রানা। তীরবেগে ছুটলো গাড়ি, নাক বরাবর সামনে অ্যারোভিয়াস অফিসের কাঁচমোড়া দরজা আর জানালা।

দরজার গায়ে লেখা রয়েছে, 'আপনার টাকার বিনিময়ে সেরা জিনিস-টা পাবেন এখানে'।

কাঁচ আর কাঠ ভাঙার শব্দগুলো মিষ্টি সঙ্গীতের মতো লাগলো কানে। ফুটপাতে ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠে পড়লো টাউন কার, জানালা আর দরজা ভেঙে সোজা ঢুকে পড়লো অফিসে।

কাউন্টারে বসা তরুণী মেয়েটি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। গর্ডন উইন্টার ছুটতে ছুটতে অফিসে ঢুকলো, দেখেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না সে। পরমুহূর্তে জানালা-দরজা ভেঙে টাউন কারকে ভেতরে ঢুকতে দেখে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো তার। কাউন্টারের পাশে গাড়িটা পৌঁছুনোর আগেই তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে পড়লো কাউন্টার, চেয়ার থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়লো মেয়েটি, মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে থামলো না গর্ডন। গাড়ি থেকে নামছে রানা, খোলা সিঁড়ি বেয়ে খোলা দোতলার দিকে তর তর করে উঠে যাচ্ছে সে। লাফ দিয়ে রিসেপশন ডেস্কের মাথায় উঠলো রানা, সিঁড়ির মাথায় দরজার গায়ে ইউ-সাইট স্থির করলো। গর্ডনের মাথার ঠিক ওপরে দু'বার গুলি করলো ও। পালিশ করা কাঠে গিয়ে লাগলো বুলেট দুটো।

দাঁড়িয়ে পড়লো গর্ডন উইন্টার। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো সে। বোকার মতো কিছু করলো না। জানে, ধরা পড়ে গেছে। হাত দুটো ধীরে ধীরে তুললো মাথার ওপর।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)